দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলির পর্ব বিভাজন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ

বাংলা ছোটগল্পের বাঁক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একজন সচেতন গদ্যশিল্পী। বিশেষত, বাংলা ছোটগল্পের 'প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' নিয়ে বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি ব্যাপৃত। তাঁর সৃজনী চর্চায় সস্তা প্রকরণ সর্বস্বতার চমক অপেক্ষা একপ্রকার অভিনবত্ব, ধ্যানগম্ভীর গভীরতা, 'শাশ্বত ধ্রুবতারা'-র সন্ধানে তিনি একনিষ্ঠ নিরাসক্ত জীবন শিল্পী। তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার এই দ্বৈতরূপের প্রবহমানতা তাঁর সৃজিত গল্পগুলির মূল প্রাণকেন্দ্র। পরবর্তীকালে নতুন রীতির গল্পলেখকেরা তাঁর সৃজিত গল্প দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিমল করের 'এই দশকে গল্প' সংকলনে যেসকল তরুণ লেখকেরা ঐতিহ্য বিরোধী গল্প লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে-শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতী নন্দী, কবিতা সিংহ, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মূলত, তরুণ লেখকদের নতুন রীতির লেখাকে উৎসাহিত করতেই বিমল করের এই পদক্ষেপ। কিন্তু পাশাপাশি ১৯৩৩-১৯৮৩ সন পর্যন্ত 'দেশ' সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলনে সাগরময় ঘোষের সম্পাদনায় তিনি প্রকাশ করেছেন মোট ৫০টি বাছাই করা গল্প। এই বাছাইয়ের কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সহযোগী সম্পাদক বিমল কর। এই সংকলনে সাবেক এবং নব্য রীতির বিরল সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রকাশিত হয়েছিল নভেম্বর ১৯৮৩ সালে। যেখানে বিমল করের 'সুখ', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বনের রাজা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'এই দশকে'-র গল্প তো কেবল তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল কর নিজেও স্বীকার করেছেন — ''জ্যোতিদারা ঠিক আমাদের আগের লেখক। মানে, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের সমসাময়িক তিনি।''[১] এঁদের আলাদা মর্যাদা দিতেই হয়তো সে সময় 'দেশ' পত্রিকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সুবোধ ঘোষের লেখার পাশাপাশি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখাও বিমল করকে টানতে লাগল। এমনকি বলা যেতে পারে, বিমল কর সম্পাদিত 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গল্পমালার প্রারম্ভিক পর্ব এগিয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটি দিয়েই। ছোটগল্পের রূপকল্প এবং অবয়ব নির্মাণে তাঁর আন্তরিক টান অদ্বিতীয়। তাঁর সব-সাময়িক লেখকবর্গরা যখন উপন্যাস চর্চায় নিজেদের অভিনিবেশ করেছেন, তখন তিনি ছোটগল্প রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন কেন? কারণ, ছোটগল্পেই তাঁর সত্তার শিকড় আলোড়িত। বাংলা উপন্যাস রচনায় তিনি ধৈর্য্যহীনতার প্রসঙ্গ জাহির করলেও ছোটগল্পের স্বতন্ত্র পরিসরেই তিনি যথার্থ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন। এখানেই তিনি উপলব্ধি করেছেন 'স্বতঃস্ফূর্ততার আস্বাদ'। গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলির পর্ববিভাগ আলোচনা প্রসঙ্গে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র প্রসঙ্গিকতা এসে পড়ে। যেখানে রাবীন্দ্রিক ছোটগল্পে ভিন্ন আঙ্গিকে, রীতিতে, অন্তর্বস্তুর বয়নে এবং ভাষায় যে প্যাটার্ন ব্যবহৃত হয়েছিল, তা পরিবর্তিত হতে থাকে চল্লিশের দশক থেকে। এই সময় বাংলা ছোটগল্পের ভাষা, অন্তর্বস্তুর বয়ন, চিত্রকল্পের প্রয়োগ, প্রতীক ধর্মিতা, গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কার্যকারণ পারম্পর্যহীনতা, গল্পহীন ঘটনা বর্জিত প্রচলিত কাহিনী ফর্মের রূপ বদলাকে থাকে। প্লট-নির্ভর গল্প এবং প্লটের অন্তর্গত নাটকীয়তার রূপ পরিবর্তন, পরিবর্জনের রীতি আমরা লক্ষ্য করি, পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে।

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলি পাঠগত ভাবে নিরীক্ষণ করলে ১৯৩০-১৯৮২ এইকাল পর্বের প্রেক্ষিতটিই মূর্ত হয়ে ওঠে। কালানুক্রমিক এই পর্বটিকে নব্যরীতির 'আবর্তন-বিবর্তন-পরিবর্তন'-এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার এক গবেষণাগার বলাই শ্রেয়। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি, বহুমুখী জীবন-বীক্ষণ বাস্তব-নির্ভর জীবনচর্যা, সেই সময়কালীন পর্বে গল্পের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের বহুমাত্রিক জীবন-জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ভাবতে শেখায়। কিন্তু ভাবনা কী আমাদের বাঁচতে দেয়? বাঁচার প্রশ্ন এবং উত্তরণ — এই দ্বৈত রূপের সমাবেশ আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পবিশ্বে পেয়ে যাই। তাঁর ছোটগল্পগুলিকে আঙ্গিক, বিষয়ভাবনা এবং কালানুক্রমিক সময়কে কেন্দ্র করে দু'টি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। উক্ত দু'টি পর্ব ধরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলির বিশ্লেষণের নিরিখে দু'টি পর্বের নামকরণ করা হল —

(ক) ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রহণের পূর্ববর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ (১৯৩০-১৯৬০)

'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র আন্দোলনের পথিকৃৎ বিমল কর গল্পের গতি প্রকৃতিতে নব নির্মিতি দান করলেও তাঁরই ভাষ্যে আমরা জানতে পারি — ''কিন্তু দেখতে দেখতে জ্যোতিদার লেখার ভঙ্গি, ভাষা আমাকে টানতে লাগল। তার প্রভাবও আমি বুঝতে পারতাম।'' [২]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে কালানুক্রমিক অনুযায়ী বিন্যস্ত করলে 'ছোটগল্প ঃ নতুন রীতি'-র পত্রিকাকে ঘিরে আন্দোলনটি যেন গল্পগুলির বাঁক পরিবর্জনের মূল বিভাজনরেখা বলে পরিগণিত হয়। এই পর্বের গল্পগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল —

তথ্যগত নিরীক্ষণের দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে তিনের দশকের কথাকার হিসেবে ধরা যেতে পারে। যদিও তিনি জীবন-জিজ্ঞাসার বৈচিত্র্য সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এক গভীরতর আত্ম-বীক্ষণের অন্বেষণে প্রকৃতির অকৃত্রিম রহস্যময়তার মধ্যেই জীবনের রূপ অঙ্কণ করতে চেয়েছেন। জীবিতকালেই তাঁর একরকম আক্ষেপ ছিল যে, তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করেছিল। কালগত দিক থেকে ১৯৩৬ সাল থেকেই 'পরিচয়' পত্রিকা, 'পূর্ব্বাশা'-কে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। ছোটগল্পের সময়কাল ও বিষয় ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে।

এই পর্বের গল্পগুলি সময়কাল অনুযায়ী বিন্যস্ত করে উল্লেখ করা হল — 'সূঁচ সূতা' (১৩৪৩, ২৬ ভাদ্র), 'আবার যখন দেখা হল' (১৩৪৩, ১১ই অগ্রহায়ণ), 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি' (বৈশাখ, ১৩৪৬), ঢাকার 'বাংলার বাণী'-তে 'জার্নালিস্ট' গল্পটি প্রকাশিত। এছাড়া 'পূর্ব্বাশা'-য় প্রকাশিত 'সূর্য', 'দেশ' পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় 'রাইচরণের বাবরি' (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৬), 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী' (১৯৩৬) — যা সমকালীন সময়ে বৃহত্তর পাঠকমহলে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই সময় তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তখন থেকেই সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ' পত্রিকার নিয়মিত একটি গল্পকার হয়ে ওঠেন তিনি। 'পূর্ব্বাশা', 'দেশ', 'চতুরঙ্গ', 'ভারতবর্ষ', 'মাতৃভূমি', 'পরিচয়', 'অমৃত', 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর', 'উল্টোরথ', 'জলসা', 'সিনেমাজগৎ'-এর মতো অজস্র পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকাশ পেতে থাকেন।

১। এই সময় 'পূর্বাশা' লিমিটেড ১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা থেকে, ১৩৫৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে 'খেলনা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি হল — 'নদী ও নারী', 'সন্ততি', 'সম্মান', 'সিংহরাশি', 'সমতল', 'খাঁকি', 'খেলনা'। এই গল্পগ্রন্থের প্রকাশকাল জৈষ্ঠ্য ১৩৫৩।

২। ‘শালিক কি চড়ুই’ গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং. লি. ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭০০০০৭ থেকে। প্রকাশ কাল ৭ই বৈশাখ ১৩৬১ সালে। উৎসর্গ করা হয়েছিল তাতাকে। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল ‘শালিক কি চড়ুই’, ‘নায়ক নায়িকা’, ‘খুকি’, ‘চড়ুইভাতি’, ‘বধিরা’, ‘ভোলাবাবুর ভুল’, ‘খেলোয়ার’, ‘চামচ’, ‘বেঙ্গমা-বেঙ্গমী’।

৩। ‘চারইয়ার’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৬১ বঙ্গাব্দে। শতভানী সাহিত্য উদ্যম, ৫৫ সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৪ থেকে। এটি উৎসর্গ করেন ছোট গল্প রসিক বন্ধুদের। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘চারইয়ার’, ‘স্ট্যাম্প’, ‘উত্তরণ’, ‘রংচং’, ‘ভিজিট’, ‘ক্যামাক স্ট্রিট’।

৪। ‘বন্ধু পত্নী’ গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৬২ বঙ্গাব্দে, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৩ থেকে। উৎসর্গ করেন বুলুকে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘বন্ধু পত্নী’, ‘মঙ্গলগ্রহ’, ‘দৃষ্টি’, ‘তারিণীর বাড়ি বদল’, ‘মেয়ে শাসন’, ‘দুপুরে গল্প’ ইত্যাদি।

৫। ‘ট্যাক্সিওয়ালা’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১ই বৈশাখ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে, ক্লাসিক প্রেস, ৩/১ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২ থেকে। উৎসর্গ করেন শ্রী সাগরময় ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বন্ধুবরেষু-কে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘ট্যাক্সিওয়ালা’, ‘ঘরণী’, ‘পালিশ’, ‘খুনী’, ‘মাছের দাম’, ‘কতক্ষণ’, ‘চশমখোর’, ‘ঘড়ির মানুষ’।

৬। ‘বনানীর প্রেম’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, আষাঢ় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে, বাসন্তী, ১৫৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে। উৎসর্গ করেন শ্রী বিমল কর বন্ধুবরেষু। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘রজনীগন্ধা গানে’, ‘গানের ফুল’, ‘রিফ্রিজারেটর’, ‘সন্দেশ’, ‘সূর্যমুখী’, ‘ইন্দ্রি’, ‘সোনার সিঁড়ি’, ‘নিষ্ঠুর’, ‘কমরেড’, ‘রিপোর্ট’, ‘আমার বন্ধু’, ‘বনানীর প্রেম’ ইত্যাদি।

৭। ‘প্রিয়-অপ্রিয়’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে, ডি. এম. লাইব্রেরি কলকাতা থেকে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল— ‘কৈশোর’, ‘গিরগিটি’, ‘আটপৌরে’, ‘বুটকি-ছুটকি’ ইত্যাদি।

৮। ‘পার্বতীপুরের বিকেল’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, মাঘ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। প্রচারিকা, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে। উৎসর্গ করা হয় শ্রীসমরেন্দ্র নন্দীকে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘সোনার স্মৃতি’, ‘সার্কাস’, ‘বিষ’, ‘দুর্বোধ’, ‘পার্বতীপুরের বিকেল’ ইত্যাদি।

৯। ‘মহীয়সী’ গল্পগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল — বৈশাখ ১৩৬৭, শ্রীলেখ পাবলিশার্স, ৯০ এ বকুলবাগান রোড, কলকাতা-৭০০০২৫ থেকে। উৎসর্গ করেন শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষকে। এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — ‘মহীয়সী’, ‘বনের রাজা’, ‘গুইনি’, ‘সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু’, ‘চোর’, ‘জ্বালা’ ইত্যাদি।

১০। ‘জয়জয়ন্তী’ গল্পগ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রণীত, নতুন প্রকাশক, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, প্রকাশিকা এ দত্ত, ২৪ সি, রামকমল সেন লেন, কলকাতা-৭, উৎসর্গ করেছেন শ্রী অজয় দাশগুপ্তকে, গল্পসূচী — ‘বুড়ীর রঙ’, ‘বাদামলতলার প্রতিভা’, ‘মোনার বিয়ে’, ‘ঋতুরঙ্গ’।

ছোটগল্প : নতুন রীতির গ্রহণের পূর্ববর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য —

ক। নিসর্গের নির্জন চিত্রকর

খ। নারী ও প্রকৃতি

গ। প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির একাত্মরূপের বৈচিত্র্য অন্বেষণ

ঘ। দাম্পত্য প্রেম ও সংকট

ঙ। যৌন চেতনায় সৌন্দর্যের সংবেদন

চ। মধ্যবিত্ত জীবনের বৈচিত্র্যময় রূপ

ছ। মনস্তাত্ত্বিক গল্প

(খ) ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রহণের পরবর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ (১৯৬০-১৯৮২)

এই পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পগুলিকে সময়কাল এবং বিষয় ভিত্তিক প্রকরণের পার্থক্য অনুসারে ভাগ করা যেতে পারে —

১। 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, ১৩৬৮ বঙ্গব্দে। এখানে সংকলিত গল্পগুলি হল — তিনবুড়ি, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহাস, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।

২। 'শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭০, ভারবি প্রকাশনী থেকে। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগ্রন্থগুলি হল — শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ।

৩। 'চন্দ্রমল্লিকা' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, রথযাত্রা ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে, জ্ঞনতীর্থ ১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে উৎসর্গ করেছেন তাপসকে। এর অন্তর্ভূক্ত গল্প — চন্দ্রমল্লিকা, সিঁধেল, ডুবুরি, অমানুষিক, কাঠপিঁপড়া, নিয়মের বাইরে, সিঁড়ি।

৪। 'মহিয়সী' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, ৯০-এ, বকুল বাগান রোড, কলকাতা-৭০০০২৫ থেকে প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭, উৎসর্গ করেছেন শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষকে। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল মহিয়সী, বনের রাজা, গুইনি, সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু, চোর, জ্বালা।

৫। 'পতঙ্গ' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, 'কল্লোল' প্রকাশনী, এ ১৩৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কাকাতা-৭০০০১২ থেকে প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — মৌচাক, টুকরো কাপড়, প্রতিনিধি, নৈশ ভ্রমণ, নিগদর্শন, রাক্ষসী, পতঙ্গ।

৬। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, কথাকলি, এ ১২ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কালকাতা-৭০০০১২ থেকে প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছ ধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর ইত্যাদি। এছাড়া এই সময়কালে প্রকাশিত বিভিন্ন গল্পগুলি হল — পূর্বাশা' পত্রিকায় 'মাঘ', ১৩৭০ সালে প্রকাশিত 'পাগল', 'নরনারী' নামে শারদীয় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আসমানী' গল্পটি। যা নিতাই বসু পরবর্তীতে সম্পাদিত অগ্রন্থিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গ্রন্থটিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। 'লাইনের ধারে' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকার ৩৬ বর্ষ, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭। 'ছিদ্র' গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল, ১৩৮৪, 'বাণী শিল্প', কলকাতা থেকে। এর সংকলিত গল্পগুলি হল — ছিদ্র, সোনার চাঁদ, মুনো ওল, ক্ষুধা, হিংসা ইত্যাদি।

এছাড়া এই সময়কালে রচিত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — 'দুই ভাই' গল্পটি (দেশ পত্রিকায়, ১৯৭০ সালে) প্রকাশিত, 'নীলফুল' গল্পটি, উল্টোরথপত্রিকার, শারদীয়া সংখ্যায় (১৯৭১)-এ প্রকাশিত। যা পরবর্তীকালে অনুষ্টুপ শরদীয় ২০০৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ক্রোড়পত্রে সংকলিত হয়েছিল।

৮। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প' অগ্রহায়ণ ১৩৮৩, নভেম্বর, ১৯৭৬। উৎসর্গ করেছেন নগৎ

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল হাজরা, বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধীমান দাশগুপ্ত।

৯। 'আজ কোথায় যাবেন' গল্পগ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল জুন ১৯৮০ সালে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। উৎসর্গ করা হয় স্বপন ও স্মিতাকে। এই গল্প সংকলনের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — 'সোনালি দিন', 'আম কাঁঠালের ছুটি', 'দুই শিশু', 'লেডিজ ঘড়ি', 'আরশোলা', 'গোধূলি', 'ভাল ছেলে খারাপ ছেলে', 'চশমখোর', 'জিয়নকাঠি সরণ কাঠি', 'আজ কোথায় যাবেন', 'গোপন গন্ধ' ইত্যাদি।

১০। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পসংগ্রহ প্রথম খণ্ড, প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসর্গ করেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে।

১ম খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — 'তাকে নিয়ে গল্প', 'এক ঝাঁক দেবশিশু', 'মহড়া', 'কেমন হাসি', 'হার', 'মাছি', 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা', 'সুখী মানুষ', 'সংহার', 'ডমি মলি', 'বসন্তকাল ও টি মজুমদার', 'গাছ', 'মিষ্টি জ্বালা', 'বাবু', 'চাওয়া', 'নিঃশব্দ নায়ক', 'বন্ধুপত্নী', 'মঙ্গলগ্রহ', 'দৃষ্টি' ইত্যাদি।

১১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৮৯, প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ৭৯/১ বি, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসর্গ করেন পলাশপ্রিয়াকে। এই খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — 'তাড়িনীর বাড়ি বদল', 'মেয়ে শাসন', 'দুপুরে গল্প', 'মৌচাক', 'টুকরো কাপড়', 'প্রতিনিধি', 'নৈশনিধি', 'নৈশভ্রমন', 'দিগ দর্শন', 'রাক্ষসী', 'পতঙ্গ', 'শ্বাপদ', 'গন্ধ', 'শয়তান', 'রূপালী মাছ', 'মহীয়সী', 'বনের রাজা' ইত্যাদি।

১২। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প' — 'নদী ও নারী', 'রাইচরণের বাবরি', 'সমুদ্র', 'বৃষ্টির পরে', 'বণের রাজা', 'বন্ধুপত্নী', 'গিরগিটি', শ্বাপদ, 'তারিণীর বাড়ি-বদল', 'মঙ্গল গ্রহ', 'চোর', 'নীল পেয়ালা', 'চন্দ্রমল্লিকা', 'পার্বতীপুরের বিকেল', 'খালপোলা ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'পতঙ্গ', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'জ্বালা', 'সামনে চামেলি', 'গাছ'।

১৩। দিনের গল্প রাত্রির গান, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রকাশিকা সুলতাধারা, রামহরি ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯, গল্পসূচী — 'দুঃস্বপ্ন', 'বিপত্নীক'।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গল্পগুলি হল —

(ক) ১৯৮৯ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প সম্পাদনা ড: নিতাই বসু।

(খ) 'অপ্রকাশিত গল্প', ড: নিতাই বসু, মহালয়া ১৯৯১ সালে প্রকাশিত। প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা -এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — কালো বউদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফুল ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।

(গ) 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প', সম্পদনা সুব্রত রাহা, অজয় গুপ্ত, ১৯৯৩, বিবেক ভারতী, কলকাতা। এর অন্তর্ভূক্ত গল্পগুলি হল — নদী ও নারী, শালিক কি চুড়ুই, মঙ্গলগ্রহ, তারিণীর বাড়ি বদল, ট্যাক্সিওয়ালা, চোর, বনের রাজা, গিরগিটি, তিনবুড়ী, সমুদ্র, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ভাত, আলোর পাখি, সেই ভদ্রলোক, জীবন, ছাতা, অজগর, সামনে চামেলি।

(ঘ) 'অগ্রন্থিত জ্যোতিরিন্দ্র' সম্পাদনা : ড: নিতাই বসু গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল 'অভিজাত প্রকাশনী' থেকে ১৯৯৯ সালে। এর অন্তর্ভূক্ত গ'গুলি হল — 'নীল ফুল', রঙের নেশা', 'আর এক বাবা', 'শিউলি গন্ধ', 'পুতুলের দেশে', 'বয়ফ্রেণ্ড', 'আঙুলের টোকা', 'লাস্ট ট্রেন', 'ডাক', 'ডাইনোসর', 'কাঠের গাড়ি ও চাঁদ', 'শ্বেত ব্যুহভেদ', 'যুদ্ধ', 'পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রেত', 'পণ্য', 'মাটির শত্রু'। উক্ত গল্পগুলির মধ্যে,

'নীল ফুল', 'আসমানী', 'মাছের গল্প', 'পণ্য' গল্পগুলি আমি নায়িকা পঞ্চবিংশতি গল্পগ্রন্থ গল্পসমগ্র, অনুষ্ঠুপ পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করেছি।

(ঙ) 'নায়িকা পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন ড: নিতাই বসু ও উত্তম ঘোষ। প্রকাশিত হয়েছিল করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা-২০০০।

আমার গবেষণা সন্দর্ভে আমি মোট পঁচিশটি গল্পগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছি। কালানুক্রমিক ধারার নিরিখে উপরিক্ত গল্পগুলিকে এবার তৎকালীন সময়চেতনা, যুগমানস এবং মানুষের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের নিরিখে বিশ্লেষণ করে জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপটি উন্মোচন করার চেষ্টা করেছি। বিশেষত, তার সত্তর বছর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই প্রকৃতির লেন্সে মানব প্রকৃতির সৌন্দর্যকে খনন করতে চেয়েছেন নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। এই সময়কালীন পরিসরে তাঁর সৃজিত গল্পগুলিকে বিষয়-ভাবনাগত শিল্পকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতগুলি উপ-বিভাগে শ্রেণিকরণ করা হল —

ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রহণের পরবর্তী পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পে বিষয় বৈচিত্র্য —

ক। মানব প্রবৃত্তির (Instinct) বহুমাত্রিক রূপ অন্বেষণ।

খ। ইন্দ্রিয় সংবেদনের প্রাবল্য।

গ। ঘটনাবর্জিত আত্মরোমন্থনে বৈচিত্র্য।

ঘ। যৌনচেতনায় ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা।

ঙ। চেতনা প্রবাহ রীতির প্রতি টান।

চ। কাহিনী গ্রন্থনাহীন বিষয়বস্তু।

ছ। প্রতীকী চেতনা ও সংলাপ।

জ। পরিস্থিতি-নির্ভর আকস্মিকতা।

কালানুক্রমিক ভাবে পর পর সাজিয়ে তথ্যগত নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে আমি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পগুলির পর্ব বিভাজন ও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ করেছি।

যুগে যুগে সময়ের কালানুক্রমিক ধারায় সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তন হয়েছে নিজস্ব নিয়মভাঙা ছন্দে। ইতিহাসে ধারাবাহিকতার পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে, অথচ স্মৃতিচয়নের ক্ষেত্রে এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম মানা হয় না। আধুনিক লেখকেরা সময়ের ধারাবাহিকতাকে মানতে রাজী নয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলেও আর্টের ক্ষেত্রে তা অনিবার্য নয় বললেই চলে। আধুনিক লেখকদের অন্যতম হাতিয়ার অতীতচারী প্রবাহে ডুব দেওয়া। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র সময়কালের প্রাসঙ্গিকতা এবং এই কালপর্বকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পধারার যে বিবর্তন — এই ধারার পিছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটিকেও অস্বীকার করা যায় না। এই সময়কালে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে কতগুলি বইয়ের দোকানের মধ্যে ১৯৫৮ সালে বীরেশ্বর বসুর 'কথামালা' এবং অজয় দাশগুপ্তের 'নিউস্ক্রিপ্ট'-এর আবির্ভাব হতে দেখা যায়। এই দুই দোকানে প্রতিদিন সাহিত্যিক আড্ডা বসত, 'কথামালা'-র মালিক বীরেশ্বর বসু হলেও দোকান খোলা, বই বিক্রি, প্রেসে যাওয়া, প্রুফ দেখা, টাকা আদায় করা সকল রকম কাজের দায়িত্ব থাকত প্রবোধবন্ধু অধিকারীর উপর। 'কথামালা'-র আড্ডায় যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — ছাত্র এবং স্কুল মাস্টার। যেমন — দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ দাশগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় সেই

সময় সদ্য আনন্দবাজারে চাকরি শুরু করেছেন। ১৯৬০ সালে 'নিউ স্ক্রিপ্ট'-এর দোকান খোলা হয়। 'কথামালা'-র ঠিক পাশেই। 'নিউ স্ক্রিপ্ট'-এর মালিক ছিলেন শ্রী অশোকানন্দ দাশ। যিনি তিরিশের দশকের কবি জীবনানন্দ দাশের অনুজ ছিলেন। 'কথামালা' থেকে হরপ্রসাদ মিত্রের প্রবন্ধের বই, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাটিয়ালী, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'ভাগ্যবলাকা', প্রবোধবন্ধুর 'বিহঙ্গবিলাস', বীরেশ্বরবাবুর নিজের লিখিত বই 'চা মাটি মানুষ', বিমল করের দুটি বই 'ফানুসের আয়ু' এবং 'পরস্পর' প্রকাশিত হয়েছিল। 'নিউস্ক্রিপ্ট'-এর স্টল নম্বর ছিল এ ১৪। সেখানে ছিলেন অজয় দাশগুপ্ত, যাকে সকলে 'খোকা' এই নামে ডাকতেন। প্রসঙ্গত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'জয়জয়ন্তী' গল্পগ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে অজয় দাশগুপ্তের নাম খোদিত। এই অজয়বাবুই বিমল বাবুকে কবি জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তিনি টালিগঞ্জের মথুরানাথ স্কুলের শিক্ষক, কাব্যচর্চার প্রতি টান থাকলেও ছড়া রচনাতেও তিনি পারদর্শী। তাঁর বিখ্যাত ছড়াটি হল 'টিকটিকি গিরগিটি দু'জনেই এম-এ, বিটি'। দেখতে ফর্সা, চোখের পুরু কাচের হাই পাওয়ারের চশমা কবি জ্যোতির্ময়ের দুই উপাস্য কবি ছিলেন টি. এস. এলিয়ট এবং বিষ্ণু দে। তাঁর 'অন্তর্মনা' উপন্যাসটি অগ্রণী বুক ক্লাব থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। পূর্ববঙ্গের ছেলে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও এ আড্ডায় নিয়মিত অংশীদার ছিল। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'বজরা'। বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তই প্রথম পাণ্ডুলিপি জমা দেন 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরে। জলপাইগুড়ির লেখক দেবেশ রায় 'হাড়কাটা' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। গল্পটির ছবি অঙ্কন করতে দেওয়া হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট ভাই শঙ্কর নন্দীকে। যিনি ফাইন আর্টের ছাত্র। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। দেবেশ রায় ১৯৫৬ সালে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গল্প 'আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা', 'দুপুর', 'পা' ইত্যাদি। বিমল কর পর্যন্ত দেবেশ রায়ের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্প প্রসঙ্গে অপছন্দের মত পোষণ করেছিলেন। অজয় দাশগুপ্তের সবচেয়ে বড় কাজ হল 'এই দশকের গল্প' বইটি প্রকাশ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যেখানে ষোল জন তরুণ লেখকের নাম ছিল। সকলের ইচ্ছে ছিল একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করবার। 'এইদশকের গল্প' প্রকাশিত হয়েছিল ষাট সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৬১ সালের সূচনায় এই বই বাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রকাশনার নাম 'পলাশী' এই গ্রন্থে ষোলো জন তরুণ লেখকের গল্প ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দিব্যেন্দু পালিত, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন ভট্টাচার্য, বিমল কর এই গ্রন্থের সম্পাদনা করলেও 'খোকা' ওরফে অজয় দাশগুপ্তের অক্লান্ত পরিশ্রমই এর প্রধান অনুপ্রেরক। অজয় দাশগুপ্তের প্রচণ্ড উদ্যমের জন্যই 'ছোটগল্প ঃ নতুন রীতি' প্রকাশিত হয়েছিল। তবে লক্ষণীয়, এই দশকের সম-সাময়িক লেখকদের কবিতার দিকে ঝোঁক বেশি ছিল। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার কিছুটা শখ করে তাঁরা গদ্য লেখার দিকে ঝুঁকলেও কবিতার প্রতি আত্মিক টান তাঁরা বেশি করে অনুভব করতেন। প্রফুল্ল রায়ের গতানুগতিক জীবন থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে গভীর অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায় জীবনকে উপলব্ধির প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল তাঁর লেখায়। যেখানে বিশেষত, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের কথাই অতিমাত্রায় ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর 'কেয়াপাতার নৌকো', 'পূর্বপার্বতী', 'নোনা জল', 'মিঠে জল', 'মহাযুদ্ধের ঘোড়া', 'ভাতের গন্ধ' রচনাগুলি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রফুল্ল রায়ের সম-সাময়িক লেখক সত্যেন আচার্য মার্জিত রুচিত গদ্য রচনা করলেও তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনন খোঁজে ফেরে কবিতার ভুবন।

এমনকি ছাত্রাবস্থা থেকেই শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ঠিক এই সময়ের সমান্তরালভাবে সত্যেন আচার্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাকে শিশির লাহিড়ী 'কালো মানিক' নামে ডাকতেন। প্রফুল্ল রায়ের জীবনধারণ প্রণালী থেকে ঠিক বিপরীত মেরুর লেখক হলেন সত্যেন্দ্র আচার্য। প্রফুল্ল রায়ের সংসার সম্পর্কিত উদাসীন মনোভাব সত্যেন্দ্র বাবুর একেবারেই নেই। তিনি বরং মার্জিত রুচির, নিয়ম মাফিক জীবন অতিবাহিত করতেন। ১৯৫৫ সালে সত্যেন্দ্রর একটা গল্প 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল 'তিন প্রধানের গল্প'। লেখক হিসেবে সত্যেন কল্পনাপ্রবণ হলেও গদ্য অপেক্ষা কবিতা লেখার ঝোঁক, ছন্দের চর্চায় তাঁর লেখার ধরণ পাল্টে গিয়েছিল। এই সময়ের অন্যতম লেখক রতন ভট্টাচার্যের অন্যতম গল্প 'পিঞ্জর' গল্পটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল। এটাই তাঁর প্রথম গল্প হিসেবে চিহ্নিত। 'পিঞ্জর' গল্পের পর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ছিল তাঁর সাড়া জাগানো গল্প। এই সময়কালীন আড্ডা কলেজ স্ট্রীটের স্থানটি থেকে ভেঙে এসপ্লানেটের কে. সি. দাশের দোকানে আর কার্জন পার্কের ডালিমতলায় পুনঃরায় বসেছিল। এবারের আড্ডায় নতুন কিছু লেখকদলে যুক্ত হয়েছিলেন। বরেন গঙ্গোপাধ্যায় তখন 'যুগান্তর'-এ নিযুক্ত ছিলেন। রতন ভট্টাচার্যের বিয়ের পরবর্তীকালের প্রথম ধাপে লেখালেখির জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের সূত্র ধরে হঠাৎ এসপ্লানেডের আড্ডায় শিক্ষকদের মিছিলের অনুষঙ্গে এসে উপস্থিত হন। যেখানে নতুন লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন — সঞ্জীব চাটুজ্যে, শেখর বসু, শিশির লাহিড়ী, সুব্রত সেনগুপ্ত, সমরেশ মজুমদার। এই রতন পুনঃরায় লেখালেখির জগতে আত্মনিয়োগ করে বারো-চোদ্দ বছরের সৃজনশীল লেখার ক্ষুধা মেটাতে শুরু করলেও আজ পর্যন্ত তার গল্পের একটা বই প্রকাশিত হয়ে ওঠে নি। তবে পূর্বে লেখক রতন ভট্টাচার্যের লেখার যে অকৃত্রিম বাঁধন ছিল, পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তা আলগা হয়ে পড়েছিল। রতন ভট্টাচার্যের সম-সাময়িক একজন লেখক ছিলেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। যিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নাতি হিসেবে পরিচিত। তাঁর প্রথম দিককার একটি গল্পের নাম 'হাউই'। যার পরিবর্তিত নাম 'বুকের বারুদ'। তবে রতন ভট্টাচার্য ও সোমনাথ ভট্টাচার্য দু'জনের আকস্মিক প্রস্থান এবং পুনরাগমন যেমন চমকপ্রদ তেমনি কার্যকারীও বটে। লেখক হিসেবে আনন্দ বাগচির উল্লেখ এরপর করা যেতে পারে। এই আনন্দ বাগদি কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র। কবিতা চর্চার দিকে ঝোঁক তাঁর অনেক পরিমাণ বেশি। আনন্দ বাগচি কৈশোরকালীন কাব্যচর্চার জন্য যৌবনেই তরুণ কবি। কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে বিমল কর প্রথম কবি আনন্দ বাগচির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি পাবনার ছেলে হলেও কলকাতাতেই তার বাল্য কৈশোর কেটেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সূচনা পর্বে তিনি ছিলেন প্রধান পাণ্ডা। শুধু তাই নয়, সুনীলদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। তবে কাব্যচর্চার পাশাপাশি তিনি গদ্য রচনাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর প্রথমদিককার অর্থাৎ ছাত্রাবস্থার গল্প 'চকখড়ি' এবং কবিতার বই 'স্বগত সন্ধ্যা'-র বই এখন বিলুপ্তপ্রায়। পরবর্তীকালে আনন্দ বাকুড়ার ক্রিশ্চান কলেজে চাকরি সূত্রে নিযুক্ত হয়েছিল। তিনি কলকাতা ছেড়ে বাঁকুড়াতে চাকরি সূত্রে অবস্থান করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাহ্যিক ঘটনার চেয়েও নেন অন্তর্ঘাতময় যন্ত্রনার নিঃশব্দ প্রলেপ লেখক আনন্দ বাগচিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক বেশি। তাঁর বাবা কলকাতায় পেনশনের টাকা তুলতে এসে আকস্মিক ভাবে স্ট্রোকে মারা যান। যথার্থ সনাক্তকরণের অভাবে হাসপাতালের মর্গ থেকে পিতার নিথর দেহ উদ্ধার করেন তিনি। শুধু তাই নয়, এই বাঁকুড়া শহরেই তাঁর মা ক্যান্সারে মারা যান। এই সময়কালীন পর্বে তাঁর লেখনি সত্তার গতি প্রকৃতিও প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'দেশ' পত্রিকার সহকর্মী হয়ে সাগরময় ঘোষ তাঁকে সাহিত্য চর্চার জগতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর লেখায় বুদ্ধি ও শব্দ চয়নের নিখুঁত ব্যবহার, বাক্য গঠনের

পরিপাট্য, কিঞ্চিৎ শ্লেষ — তাঁর রচনাকে অসামান্য করে তুলেছে। এমনি তিনি ত্রিলোচন কমলচি ছদ্মনামে রম্য ও হাস্যময় রচনাও লিখেছেন। এরপর আসা যেতে পারে মুর্শিদাবাদের ছেলে সৈয়ন মুস্তফা সীরাজের কথায়। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'ভালোবাসা ও ডাউনট্রেন' গল্পটি ছাপা হয়েছিল। কলকাতায় এসে তিনি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সম-সাময়িক লেখকবৃন্দ সকলেই বিমল করের পরিচিত ছিলেন, যেমন — বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়। সম্ভবত বরেন গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই ১৯৬৬ সাল নাগাদ বিমল করের সঙ্গে সৈয়ন মুস্তাফা সিরাজের পরিচয় করিয়ে দেন। জীবনের নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা, জীবন-জিজ্ঞাসা, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের গ্রাম্য প্রকৃতির চিত্ররূপ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নিজের মননঋদ্ধ চেতনায়। তাঁর পিতা সুদক্ষ পণ্ডিত ও মাতার কবিতা গল্প চর্চার সূত্রে ছোটবেলা থেকেই সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের চেতনায় কাব্যচর্চার বীজ উপ্ত ছিল। তাঁর কাব্য প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে 'দেশ' পত্রিকার প্রধান প্ল্যাটফর্ম। শুধু তাই নন, তিনি ছিলেন আলকাপ দলের মাস্টার। ১৯৫০ সালে একটা বাঁশের বাঁশি ফিরিয়ে নিয়ে গেল গ্রামীন মিথের অতি পরিচিত জগতে। কলকাতায় আসার পর সরকারী কাগজ ভাণ্ডারে কাজ নিয়েছিলেন। এরপর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন — যা তাঁর লেখালেখির জগৎকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি পরবর্তীকালে নাগরিক জীবনে প্রবেশ করলেও গ্রামবাংলার প্রতি তাঁর কাব্যিক অভিজ্ঞতা লেখায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে ব্যঞ্জনার দ্বৈতরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায় অসামান্য কর্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে। এই সময়ের তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্যতম শ্যমল গঙ্গোপাধ্যায় খেয়ালি মানসিকতার লেখক ছিলেন। তখন তিনি টালিগঞ্জের মথুরানাথ বিদ্যাপীঠে মাস্টারী করতেন। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার সূত্রে তিনি নিযুক্ত হন। তাঁর প্রথম গল্প 'তুষার হরিণী', 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল কর তাঁর সাহিত্যিক জীবনে লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে 'প্রেমাঙ্কুর আতর্থী' নাম টেনে আনেন। তিনি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রেমাঙ্কুরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য টেনে আনেন। বিমলবাবু এই প্রেমাঙ্কুর সম্পর্কে একটি গল্প পাঠ করেছিলেন নলিনীকান্ত সরকারের লেখায়। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের স্তর থেকেই উঠে আসা কতগুলি প্রত্নতথ্য থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে পাঠক বর্গের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতা বেতারকেন্দ্রর জন্ম হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৬শে আগষ্ট। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের মুখপত্র হিসেবে 'বেতার জগৎ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। দেড় বছর পর ঐ পদে এলেন নলিনীকান্ত সরকার। আট পাতার কাগজে পত্রিকাটি শুরু হলেও ধীরে ধীরে অবয়ব বেড়ে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচীর সঙ্গে ছাপা হতে শুরু করে বেতারে প্রচারিত কথিকা, গানের স্বরলি, গল্প, ছড়া এবং বেতার শিল্পীদের ছবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রেখে এই পাক্ষিক পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আকাশবানী ভবনে আলাদা অফিসঘর খোলা হল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণভদ্র বলতেন 'বেতারজগৎ' বেতারের চেয়ে বেশ কয়েক মাসের ছোট। সরকারী নির্দেশে ১৯৮৬ সালে বেতার জগৎ প্রকাশনা বদ্ধ হয়ে যায়। (২১.১১.১৯৯৮/আকাশবানী কলকাতা)

এরপর বিমল করের সাহিত্য জীবনের সঙ্গী হিসেবে পূর্ববঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদের ছেলে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গ থেকে এপারে দেশ ছাড়া হয়ে এসেছিল অতীন। জীবনের বিচিত্রমুখী অভিজ্ঞতা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল বইকি। চায়ের স্টলে কাজ, ব্যণ্ডেজের কাপড় তৈরী, তাঁতীদের তাঁত চালানো, ধুপ বিক্রি, জাহাজে কোল বয়ের চাকরি

— ইত্যাদি নানারূপ কর্মমুখরতার মধ্য দিয়ে জীবনকে অবলোকন করা। ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং অতীত বন্দ্যোপাধ্যায় লেখনি চর্চার দিকে ঝুঁকেছিলেন। জাহাজে কর্মরত অবস্থায় সে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরেছিল — সমুদ্র তাঁকে আপ্রাণ এক রহস্যময়তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'রূপকমাত্র', 'দেশ' পত্রিকায় ছাপ হয়েছিল। তাঁর গদ্য ভাবনা সামান্য জটিল, বাক্যের সঙ্গে শব্দের ও নতুন ব্যবহার তাঁর লেখার বাধুনীকে প্রাঞ্জল করে তুলেছে।

'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রন্থমালায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্ত মাংস' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। যা পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তিনি মূলত পেশাদারী মনোভাব নিয়ে লেখেননি। তিনি খুবই 'সেনসেটিভ' আধুনিক লেখক। মানবমনের জটিল চিত্তবৃত্তিকে খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেন তিনি। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতনই স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া থেকে এসেছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'জলপোকা' নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। বাড়ি হাওড়ায় থাকলেও চাকরি করতেন গার্ডেন রিচ-এ রেলের অফিসে। একপ্রকার আস্থাশীল চিত্তবৃত্তি নিয়ে স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুকুল ঠাকুরের প্রতি নিবেদিত প্রাণ।

এরপর হালিশহরের যশোনাজীবন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি, বরেন গঙ্গোপাদ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক লেখক। 'প্ল্যাটফর্মের গল্প' — লেখার সুবাদেই যশোদাজীবন পাঠকমহলে পরিচিত লাভ করেছিল। 'দেশ', 'পরিচয়', 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁর লেখা সেসময় প্রকাশিত হয়েছিল। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আনন্দবাজার রবিবাসরীয় দপ্তরে ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই বিমাল কর জানতে পারেন সুধাংশু ঘোষ সম্পর্কে। তখনও কলেজ স্ট্রিটের আড্ডাটি চলছিল জমজমাট, সময়কালের দিক থেকে পেছনের দিকে। এই সুধাংশুই বিমল করের 'খড়কুটো' সম্পর্কে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় লিখেছিলেন। তিনি একাধারে সেন্ট পলস্ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। এর পাশাপাশি দৈনিক 'বসুমতী' পত্রিকার সাংবাদিকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি লেখা শুরু করেছিলেন তরুণ বয়সে। তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'স্বাতী'। এই বয়স থেকে তিনি নানা কাগজে লিখতেন — 'অগ্রণী', 'চতুষ্কোণ', 'নতুন সাহিত্য'। তবে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি বেশি লিখেছেন। এই পত্রিকার দেখা শোনার দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল। তাঁর লেখার সংখ্যা খুবই কম। তাঁর গল্পের সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশটি। উপন্যাসের সংখ্যা বড়জোড় চার-পাঁচটি। 'ফানুসের উপমা', 'তারুণ্যের স্বর', 'কে বাজায়' ইত্যাদি। বোধ এবং অনুভূতি নির্ভর লেখা তার কলমের আঁচড়ে ফুটে ওঠে। তিনি নিজের লেখা সম্পর্কে বলেছেন — ''এ-পর্যন্ত কী লিখতে চেয়েছি? সময়ের ধাবমানতা নৈর্ব্যক্তিক। মানুষের বাসনা-কামনা ব্যক্তিগত। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত অনুভব আমার প্রায় সব লেখার মূল বিষয়।''[৩]

বিমল করের পুরনো বন্ধুর মধ্যে শিশিড় লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। নিবাস সাঁতরাগাছি। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় একসঙ্গে সহপাঠী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন — শিশির লাহিড়ী, তরুণ ভট্টাচার্য। সেই সময়কালের পরিধিতে দাঁড়িয়ে লরেন্স হাক্সলি, নোয়েল কাওয়ার্ড প্রমূখ লেখকদের লেখালেখি পড়া তথা সাহিত্যে উত্তেজনার হাওয়া বইছিল। যুদ্ধের সময়কালীন মুহূর্তে সকলে মিলে একটি বড় পত্রিকা প্রকাশ করেছিল। কাগজটির নাম 'পূর্বমেঘ'। এক কি দুই সংখ্যায় বেরিয়েছিল। শিশির লাহিড়ীর কিছু গদ্যপদ্য এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের আড্ডা তখন ভেঙে গিয়ে কার্জন পার্কের ডালিম তলায় আড্ডা জমেছে। এই শিশির লাহিড়ী নির্মলেন্দু লাহিড়ীর ভাই, শিশির ভাদুড়ীর মামাতো ভাই। শিশির লাহিড়ীর লেখা গল্পগুলির মদ্যে অন্যতম 'শিক কাবাব', 'অ্যাকুরিয়াম' গল্পটি। তবে তাঁর লেখার বিষয় বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত জীবন। বিমল করের মতে ১৯৬৬ সাল থেকে

কলেজ স্ট্রিটের আড্ডার পাঠ প্রায় শেষ হয়ে এল। কারণ সকল আড্ডাধারীরা ঠিকমতো হাজির হতে পারছে না। বিমল করের নিজের পক্ষেও মাইল সোয়া মাইল হাঁটা সম্ভব নয়। এরপর কে. সি দাশের দাশের দোকানে বিকেলে মাঝে মাঝে আড্ডা বসে। নতুন আড্ডা বসেছে এসপ্লানেডে। তবে এক্ষেত্রে পুরনো আড্ডার সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য বলা যেতে পারে। আমাদের কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের আড্ডায় দুই বয়োজ্যেষ্ঠ অসামান্য লেখক উপস্থিত ছিলেন — প্রথমত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দ্বিতীয়ত, কমলকুমার মজুমদার। অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিমল করের তুলনায় বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা যখন 'ছোটগল্প ঃ নতুন রীতি' গ্রন্থমালা প্রকাশ করেন, তখন প্রথমে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বলা হয়েছিল গল্প দেওয়ার জন্য। বিশেষত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প দিয়েই 'ছোটগল্প ঃ নতুন রীতি' শুরু হয়েছিল। এই গ্রন্থমালার প্রথম গল্পই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' দিয়ে শুরু। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে একধরণের নিরাসক্তি রয়েছে। অনেক ব্যাপারেই তিনি উদাসীন। তাঁর জীবন-বীক্ষায় শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতিও এক বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। বিমল কর কলেজের সময় থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প পাঠ করে এসেছেন। সমান্তরাল ভাবে মাঝে মাঝে কমলকুমার মজুমদার কখনো কখনো কলেজ স্ট্রিটের আড্ডায় যোগ দিতেন। কমলকুমারের সঙ্গে বিমল করের পরিচয় ঘটেছিল আনন্দবাজার অফিসে। তাঁর তখনকার লেখা গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'মতিলাল পাদরি', 'তাহাদের কথা', 'অন্তর্জলি মাত্রা' — ইত্যাদি। বিমল করের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কমলকুমার মজুমদার বাইরে যতই সদানন্দ হোন না কেন অন্তরে তিনি সাধক পুরুষ মানুষ ছিলেন। এর পরবর্তীতে কলেজ স্ট্রিটের আড্ডা ভেঙে যাওয়ায় মানুষটির সঙ্গে আর পরিচয় ঘটেনি। বিমল করের কাছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমার দু'জনেই ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত। কলেজ স্ট্রিটের আড্ডায় তাঁরাও উপস্থিত হতেন। অমলেন্দু চক্রবর্তীর একটি গল্প 'কোনো এক লেখক বন্ধুকে' যা পরবর্তীকালে 'এই দশকের গল্প' সংকলনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। অনেক চিঠির ঢঙে লেখা গল্প এটি। অমলেন্দু চক্রবর্তী এম. এ পাস করার পরে খিদিরপুরে বাংলা পড়ান। তাঁর আরও গল্প 'একদিন প্রতিদিন' এবং 'অকালের সন্ধানে' তাঁকে পরিচিতি দিয়েছে। কলেজ স্ট্রিটের আড্ডায় আর একজন আসতেন, তাঁর নাম কল্যানশ্রী চক্রবর্তী। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' বার করার সময় বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও টাকার যোগাড় করতে তিনি বিমল করকে সাহায্য করেছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর চার-পাঁচটি গল্প বেরিয়েছিল। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের আড্ডা ভেঙে দিয়ে নতুন আড্ডা গড়া হল কে. সি. দাশের আর কার্জন পার্কের ডালিমতলায়। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নামটিও এসে পড়ে। একবার দমদম স্টেশনের কাছে অনুষ্ঠান চলছিল। শ্যামাবাবু বলে একজন 'যুগান্তর' পত্রিকার রির্পোটার অনুষ্ঠানের গুরু দায়িত্বেই ছিলেন। তিনিই বিমল করকে তাঁদের অনুষ্ঠানে ধরে নিয়ে গেলেন। সেখানে 'কবিতা পাঠ'-এর আসরেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিমল করের আলাপ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'জনসেবক' পত্রিকার অফিসে ছিলেন। এই 'জনসেবক' কাগজে তিনি রবিবারের পাতা দেখতেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও এই 'জনসেবক'-এ ছিলেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এবং শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গঙ্গোপাধ্যায়। বিমল করের অভিজ্ঞতায় তিনি কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' প্রকাশ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকের কাছেই 'নতুন রীতি' নিয়ে বিতর্কিত সমালোচনা করেছিল। ফলে তরুণ লেখকেরাও নানা জনের কাছে বীতরাগ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি একটি পত্রিকায় 'নতুন রীতির' লেখা নিয়ে বেশ গালাগালই প্রদর্শন হয়েছিল। অনেকেরই ব্যাপারটি অসহ্য ঠেকেছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে আগ্রহী হয়ে তাঁর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় এই সমালোচনার জবাব লিখিয়েছিলেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক ও

তাঁর বন্ধুরা এই নতুন রীতির ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কবি হিসেবে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েও অন্যসকল নতুন তরুণদের প্রতি তাঁর ছিল মানসিক ঔদার্যের ভাব। কেবল কবিতা এবং 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা এ দু'টি জিনিস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাণ বিন্দু হলেও কলেজ জীবনের শুরুতেই গল্প লেখা শুরু করলেও পরবর্তীতে তা লেখা বন্ধ করে কবিতার প্রতি তাঁর মানসিক ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে 'দেশ' পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় সাগরময় ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে উপন্যাস লিখিয়েছিল। 'আত্মপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে তাঁর মেজাজও অ্যাটিটিউড অসাধারণ ভঙ্গিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। কবি ও গদ্যশিল্পী হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠক মহলে পরিচিতি লাভ করে ফেলেন। তাঁর লিখিত উপন্যাস, 'যুবক-যুবতীরা', 'আত্মপ্রকাশ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' — তাঁকে পৃথক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। তাঁর লেখায় স্পষ্টবাদী ও অসংকোচ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশই প্রতিফলিত। নিরাসক্ত হয়ে কোনো লেখা তাঁর নেই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো কোনো উপন্যাস যেমন — 'অর্জুন', 'জীবন যেরকম', 'আমিই সে' — এসব লেখায় তাঁর প্রতিভা এবং গভীর জীবন-নিষ্ঠার পরিচয় রয়েছে। বিমল করের উপলব্ধিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মেজাজে জীবনে গভীর বেদনার অস্তিত্ব, জীবনের উত্তাপ-অনুভূতির প্রতিফলন লক্ষ্যনীয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম — 'গরম ভাত' কিংবা 'নিছক ভূতের গল্প', 'মহাপৃথিবী', 'পোস্ট মর্টেম' ইত্যাদি। নতুন আড্ডায় যোগ দিয়েছিলেন বিভূতি রায়, লেখক হিসেবে তার ছদ্মনাম অভ্র রায়। লেখক প্রলয় সেন এবং তুলসী সেনগুপ্ত — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, নতুন আড্ডায় তাদের আবির্ভাব ঘটে গেল। এরপর নতুন আড্ডায় সমবেত লেখকবৃন্দের মধ্যে অন্যতম — সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, কল্যান চক্রবর্তী, সুনীল দাশ, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, আশিষ ঘোষ, শৈবাল মিত্র এবং কণা বসু মিশ্র যে কিনা এম. এ. পড়ার সময় থেকেই লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনিও আসতেন। কে. সি. দাশের নীচের তলায় বারো আনা চেয়ারে সকলে দখল হত। ফলে অন্যান্য খদ্দেররা অসন্তুষ্ট হতেন ঠিকই। শেষ পর্যন্ত চা ও সিঙ্গাড়ার পাট চুকিয়ে তারা সকল লেখক শিল্পীরা চলে আসতেন কার্জন পার্কে, সেখানে রেসের বাবু ও কেরানি বাবুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোল করে হাত পা ছড়িয়ে সকলে বসে বড়তেন। একদিন সুব্রত সেনগুপ্তের ভাবনা অনুসারে এই আড্ডাটির নাম করণ করা হল — 'ডালিমতলার আড্ডা'। ডালিমতলায় আড্ডার সময় ছিল সাড়ে পাঁচ বা ছ'টা থেকে আটটা পর্যন্ত। এরই মাঝে সাহিত্য নিয়ে তর্ক-কথাবার্তা। প্রবল তর্ক উঠে সাহিত্য চর্চার অধিবেশনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গরমকাল অপেক্ষা বৃষ্টির দিনে এসপ্লানেট ট্রাম ঘুমটিতে ডিফেকটিভ ট্রাম একটা-আধটা থেকেই যেত। বর্ষার দিনে এখানে আশ্রয় নিয়ে সাহিত্য চর্চা চলত। নতুন আড্ডায় যে নতুন লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। বরাহনগরে কুটিঘাট রোডের দিকে তাঁর বাড়ি। তিনি একদিন বিমল করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লেখালেখি প্রদানের কথা জানান। তা তিনি এ প্রসঙ্গে সাগরময় ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ধীরে ধীরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখনিসত্তার জাগরণ ঘটতে শুরু করল। সঞ্জীববাবুই তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে বিমল করের অফিসে নতুন কার্জন পার্কের আড্ডায় চলে আসতেন। দু'জনের মধ্যে একপ্রকার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সঞ্জীববাবুর সাহিত্যের ঝোঁক বরাবরই ছিল। চাকরির পাশাপাশি একপ্রকার সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যময় জীবন ছিল তার। কিন্তু পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে নিজেকে পালটে ফেলেছে। তিনি গল্পের পাশাপাশি ছোটকাগজে কবিতাও লিখতেন। 'দেশ' পত্রিকাতে গোড়ার দিকে গল্প লিখেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'শ্বেতপাথরের টেবিল'। তাঁর লেখার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সঞ্জীববাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার অনুরাগী। কিন্তু তবুও এঁদের দু'জনের

স্বতন্ত্র্য রয়েছে। আপাত হাসির আড়ালে তার অন্তরে মানবিক দুঃখের চাবুক তাঁর গল্পগুলির সোপান। নিতান্ত জনরুচির জন্য তিনি লেখেন না।

কার্জন পার্কের ডালিমতলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে — মাথার উপর আকাশ, নিচে মরা ঘাস, আশেপাশে ফুলগাছের ঝোপ, যদিও ফুল ফোটার বালাই নেই; মেঠো ইঁদুরের ছুটে বেড়ানো, গঙ্গার দিক থেকে বাতাস ছুটে আসা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থানটি পরিপূর্ণ। সমরেশ মজুমদার এর 'উত্তরাধিকার' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। চা বাগানের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে সমরেশ মজুমদারের বাল্য, কৈশোর ও তারুণ্যের খানিকটা কেটেছে। চা বাগানের বাইরের জগৎটা শিলিগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়ির জগতে কাটিয়েছে। মোটামুটি ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে তিনি লেখার জগৎ-এ 'উত্তরাধিকার' তাঁর বহু পঠিত উপন্যাস। বিমল করের ভাবনায়, অসুস্থতা অবস্থাতেই প্রকাশিত গ্রন্থটি তিনি পেয়ে যান। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাসের চরিত্রগুলি সজীব চরিত্র। জীবন থেকে উঠে আসা জীবন্ত চরিত্র।

ডালিমতলায় আড্ডায় একবার কথা প্রসঙ্গে নতুন পত্রিকা প্রকাশের প্রসঙ্গ উঠেছিল। সকলের আগ্রহে পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল 'গল্পবিচিত্রা'। বর্ষাকালে ডিটেকটিভ ট্রামে বসেই পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল। দিল্লি থেকে চিঠি পেয়ে পত্রিকা প্রকাশের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। ছোটগল্প নতুন রীতির কমাণ্ডার ইন্ চিফ যিনি অজয় দাশগুপ্ত ছিলেন। 'গল্পবিচিত্রা' প্রকাশ করবার সময় তিনি মর্ডাণ ইণ্ডিয়া প্রেসে কাজ করতেন। পরবর্তী কালে তার প্রেসে নয়, হীরক রায় বলে একজন এখানে আড্ডা দিতেন। তিনিই প্রেসের ব্যবস্থা করেছিলেন। 'গল্প বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৮০ সালে (১৯৭৩)। প্রথম সংখ্যাটিই শারদীয়া সংখ্যা। সম্পাদক ছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও বিক্রি কম হয়েছিল। এই পত্রিকায় লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমূখ। চল্লিশজন গল্প লেখকের গল্প নিয়ে শারদীয়া সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। আরও তিন-চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর গল্পবিচিত্রা উঠে যায়। এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদে ছবি এঁকেছিলেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলঙ্করণে সাহায্য করেছিলেন সুধীর মৈত্র আর গৌতম রায়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু প্রতীম কল্যান চক্রবর্তী। কল্যানের কালচারাল হেরিটেজ হল বেলেঘাটার। বেলেঘাটারই প্রতিনিধি তিনি। কল্যান চক্রবর্তী নিজে কুড়ি-বাইশ পাতার 'দরবারী সাহিত্য' প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেটা এমনিতেই অনিয়ম করে ফেলেছে। কে. সি. দাশের আড্ডার সময় তুলসী সেনগুপ্তকে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি 'দেশ', 'আনন্দবাজার'-এ লেখা শুরু করেছিলেন। পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথাগুলিই তার গল্পের বিষয়। একবার মনোজ বসুর বাড়িতে সান্ধ্য-নিমন্ত্রনে বিমল করের সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে বুদ্ধদেব গুহের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মুখোমুখি। বুদ্ধদেব গুহ মাঝে মাঝে আনন্দবাজার অফিসে যেত রবিবাসরীয় দপ্তরে। 'দেশ' পত্রিকার দপ্তরটিও পাশাপাশি হলেও পার্টিশানের আড়ালে আসা-যাওয়া চোখে পড়ার কারণ ছিল না। বুদ্ধদেব ছিলেন আড্ডার বাইরের লেখক বন্ধু। তীব্র অন্তর্জিজ্ঞাসা থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনার শুরু। বুদ্ধদেব গুহ তাঁর আত্মস্বীকৃতিতেই তিনি জানিয়েছেন যে, রমাপদ চৌধুরীর উৎসাহই তাঁর সাহিত্য জগতের আবির্ভাব। তাঁর প্রকাশিত প্রথম বই 'কোয়েলের কাছে'। মানুষ বুদ্ধদেব গুহ কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ভালো গায়ক। কিন্তু স্ত্রী ঋতু গুহর অসাধারণ গায়কির জন্য তাঁর কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এছাড়া আড্ডার বাইরের লেখকজন হলেন কাঁচড়া পাড়ার মিহির মুখোপাধ্যায়, চুঁচড়োর সমীর মুখোপাধ্যায়। দু'জনের মধ্যে

মিল এখানেই দু'জনেই মাস্টারী করেন। মিহির মুখোপাধ্যায় কলেজে এবং সমীর স্কুলে পড়ায়। প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রথম মিহিরের সঙ্গে বিমল করের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মিহির মুখোপাধ্যায়ের লেখায় চমৎকারীত্বের চেয়েও রয়েছে মানবিক আবেদন। 'গল্পবিচিত্রা' যখন প্রকাশিত হয়, তখন বিশ-পচিশটি কাঁচা পাকা আড্ডাধারী লেখকের আবির্ভাব ঘটে কার্জন পার্ক এবং কে. সি. দাশের দোকানে। তাঁদের মধ্যে একদল উড়ো আড্ডাবাজ 'ফ্লইং পার্টি' নামে পরিচিত ছিল। এদেরই অন্তর্ভূক্ত প্রলয় সেন। তিনি ঢাকুরিয়াতে থাকতেন, ব্যারাকপুর কলেজে পড়াতেন। প্রলয় সেন নিজে গল্প লেখক। তাঁর অনেক গল্পই নানা কাগজে ছাপা হয়েছে। তাঁর লেখা একটি উপন্যাস 'সীমাস্বর্গ'। সেইসঙ্গে তিনি একজন দক্ষ অনুবাদক। তিনি কাফকার গল্প 'মেটামরফসিস' অনুবাদ করেছেন। ফ্লাইং পার্টির আরও দু'একজন লেখক হলেন সমীর রক্ষিত এবং বিভূতি রায়। সমীর রক্ষিতের একটি ভালো গল্প 'খড়গ'। যা পড়ে বিমল কর মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি উত্তরবঙ্গের ছেলে, পেশায় আরকিটেক্ট ফার্মে না থেকে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে ঢুকলেন। সমীর রক্ষিতের প্রকাশিত বই — 'বন্যার পর বাড়ি ফেরা'। অতি তীক্ষ্ণ ও আত্মসচেতন লেখক তিনি। বিভূতি রায় ও নিয়মিত আড্ডায় লেখক হিসেবে ছিলেন। তিনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। বিভূতি রায়ের সঙ্গে বিমল করের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সেন্ট পল্‌স কলেজে বাংলা পড়াতে ঢুকে গেলেন। বিকেলের দিকে 'দেশ' পত্রিকা ঘুরে তাকে কার্জন পার্কে চলে আসতে হত। তাঁর নাম বিভূতি রায় হলেও লেখার সময় তা পালটে নাম রেখেছেন অভ্র রায়। বিভূতি রায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী সময়ের লেখক। অভ্র রায়ের প্রথম উপন্যাস 'হৃদয়ের শব্দ'-এ তিনি বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিভূতি রায় সেন্ট পল্‌স কলেজ থেকে চলে যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারী করাতে। কণা বসু মিশ্র — যাঁর এম. এ. পড়তে পড়তেই গল্প লেখার ঝোঁক। বিয়ের পর তিনি চলে যান দুর্গাপুরে। কলকাতায় এলেই অন্তত একবার কার্জন পার্ক কিংবা কে. সি. দাশের আড্ডায় হানা দেন। এই কার্জন পার্কেই হাজির হয়েছিলেন বয়স্কা মহিলা লেখিকা শান্তা চক্রবর্তী। যিনি 'উত্তরসূরি' পত্রিকায় 'কবিতা' এবং 'শনিবারের চিঠি'-র শেষের দিকে বোধ হয় দু-চারটি গল্প লিখেছিলেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন 'মাদার'। এই আড্ডারই অন্যতম লেখিকা গীতা গঙ্গোপাধ্যায়। লেখার শখ বা পত্রিকা প্রকাশের নেশাতে নয় ষোলো আনা আড্ডার ঝোঁকে তিনি হাজির হতেন। তিনি বিখ্যাত অভিনেতা প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী হিসেবে তিনি আড্ডার মধ্যে বিখ্যাত। সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও রেডিওতে নাটক প্রযোজনা ও অভিনয় করেন তিনি। বিমল করের সম্পাদনায় তরুণ লেখকদের নিয়ে 'এই দশকের গল্প' নামে গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ডালিম তলার আড্ডায় তরুণ লেখকদের মধ্যে ছিলেন — শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, রমানাথ রায়, আশিষ ঘোষ, কল্যাণ সেন প্রমূখ। এঁর ছোটখাটে লিটিল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করতেন। এছাড়াও ছিলেন সুনীল দাশ। তিনি শেখর বসুদের সম-সাময়িক লেখক। 'দেশ' পত্রিকার সূত্র ধরেই বিমল করের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সুনীল দাশ তীর্থপতি ইন্সটিটিউশনে বাংলা পড়াতেন। তার কাছে বিমল কর দক্ষিণ কলকাতার তরুণ সাহিত্যিক মহলের গল্প বেশি শুনতেন। এমনকি সিনেমা মহলের গল্পও তিনি বলতেন। তাঁর একটি নাটকের দল আছে। বাংলা নাটকের সংলাপ নিয়ে তিনি গবেষণার কাজ করছে। সুনীল দাশের একটি সিনেমা 'একদিন সূর্য' প্রকাশিত হয়েছিল এলিট সিনেমায়। এরপর তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকায় কোনো এক নিমন্ত্রণে। সেখানে বাংলা সাহিত্যের ধ্বজা উড়িয়ে ফিরলেন কলকাতায়। তবে গল্প উপন্যাস লেখার চেয়ে নাটকের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশি। এই আড্ডায় তরুণ লেখকদের মধ্যে আরও ছিলেন

— সমীরণ দাশগুপ্ত এবং জগদীশ মুখোপাধ্যায়। সমীরণ দাশগুপ্ত হালিশহরের মানুষ। পূর্বে হালিশহরের প্রাচীন ঐতিহ্য খানিকটা রক্ষা করেছিলেন যশোদাজীবন ভট্টাচার্য। তিনি খানিকটা প্রতিভা দেখিয়ে পালিয়ে যান বিহারের কয়লা খনি এলাকায়। যাবার পূর্বে ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সমীরণ দাশগুপ্তকে। নৈহাটির তরুণ সাহিত্যিক মহলের অনেকেই তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। যেমন — সোমনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। ভালো গল্প লেখক হিসেবে তিনি 'দেশ' ও অন্যান্য পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'মৃত্তিকা' নামে তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত। যা তাঁর প্রথম রচনা। অপর একজন তরুণ লেখক হলেন জগদীশ মুখোপাধ্যায়। ছেলেটি বার্ণপুরের অধিবাসী। বার্ণপুরের কারখানায় কাজ করত। কিন্তু আসল নেশা ছিল সাহিত্য প্রীতি। পরবর্তীকালে জগদীশ মুখোপাধ্যায় জ্যোতিষ চর্চায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলে বার্ণপুরের রাজজ্যোতিষী হয়েছিলেন পড়ে। বিমল করের সাহিত্য অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে কিছু তরুণ অপরিচিত কিংবা স্বল্প পরিচিত লেখকদের অবস্থিতিও অস্বীকার করতে পারেন নি তিনি। লেখক নয়, তবে সাহিত্যানুরাগী তরুণ শিল্পী বন্ধুর মধ্যে অন্যতম হলেন নিতাই দে। সুবোধ দাশগুপ্তের মতো তিনিও ছিলেন বিমল করের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলেজ স্ট্রিটে তার যাতায়াতই নয়, কার্জন পার্কের আড্ডাতেও তিনি যেতেন। নিতাই দে 'দেশ' 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-এ গল্পের ছবি আঁকা ছাড়া এক পাবলিসিটি ফার্মে চাকরি করতেন। সুবোধবাবু কিংবা নিতাই বাবুর উপরেই লেখকদের প্রকাশিত বই-পত্রে মলাটের ছবি আঁকার দায় পড়ত। বিমল করের 'এই দশকের গল্প' সংকলনটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নিতাই দে। এমনকি 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রন্থমালার প্রচ্ছদ আঁকার এবং সাজসজ্জার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। প্রফুল্ল গুপ্ত চুঁচড়োর অধিবাসী, যিনি পেশায় কন্ট্রাক্টর ছিলেন — বিমল করের বন্ধুস্থানীয়। শুধু সাহিত্য চর্চার ব্যাপারেই নয়, সমগোত্রীয় লেখকদের সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে তিনি বেশী উৎসাহী ছিলেন। বিমল করের 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র ক্ষেত্রে তিনি বিমল বাবুকে নানা ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। বিশেষত নিজের বিলেত প্রবাসী ছোট ভাই মিহির গুপ্তের কাছ থেকে অসামান্য দু'টি গল্প বিমল করকে এনে দিয়েছিলেন। যার একটি গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, অন্যটি 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়েছিল। তরুণ লেখকদের মধ্যে একজন ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার তখন দারুণ দাপট। শ্যামবাজারের কফি হাউস, পাঁচ মাথার মোড়, মোহনলাল মিত্র স্ট্রিটে তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। বিমল করের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠতা তখন থেকে যখন তিনি 'আনন্দবাজার' এবং 'দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেছেন। তারপর একদিন তিনি 'আনন্দবাজার' চাকরিতে যুক্ত হয়েছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় একাধারে বড় কবি এবং গদ্য শিল্পী। তাঁর 'কুয়োতলা' উপন্যাসটি ছেপেছিল চিও সিংহ। এছাড়া 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় এক বিশেষ সংখ্যায় শক্তির লেখা 'অবনী বাড়ি আছো' প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া গদ্য লেখা বলতে ভ্রমণকাহিনী, ঘোরাফেরার গাইডবুক হিসেবে চটি কয়েকটি বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বিমল করের অভিজ্ঞতায় তাঁর দু'টি রূপ — প্রথমটি বচনে, বাচনে, স্বাভাবে, আন্তরিকতায় হৃদয়ের উষ্ণতার অভাব নেই, দ্বিতীয়টি মহাশক্তি। শক্তি সুনীল গঙ্গোপাদ্যায়ের সমগোত্রীয় 'কৃত্তিবাস'-এর কবিকুলের অন্যতম বড় কবি হলেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি শুধু কবিতা নন, শৌখিন গদ্য লেখক হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। শরৎকুমারের গদ্য লেখবার হাত একেবারে ঝরঝরে বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি সাগরময় ঘোষের অনুরোধে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। নাম — 'সহবাস' এবং 'কথা ছিল'। কিছু গল্পও তিনি লিখেছেন। শরৎকুমারকে বিমল কর প্রথম দেখেন প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেখানে বিমল করের সঙ্গে

তার আলাপচারিতা। এরপর তাকে বেশির ভাগ সময় 'আনন্দবাজার' অফিসেই দেখেছেন তিনি। একসময় কলকাতা থাকতে থাকতে শরৎকুমার দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে শরৎকুমার গদ্য লেখার দিকে কিছুটা ঝুঁকেছিলেন। শরৎকুমারের ভাষ্যে ভাবালুতা, আবেগ বাদ দিয়ে তিনি গদ্য লিখতে চান। বিমল করের পরিচিত তরুণ লেখকদের মধ্যে কবিদের সংখ্যা কম হলেও সাহায্য গুলি অস্বীকার করা যায় না। গল্প নাই লিখুক, যারা দিনের পর দিন আড্ডা মেরেছে, গল্প করেছে এর মধ্যে সুনীল বসু একজন। তিনি আনন্দবাজারের নিউজ এবং পরে রমাপদ চৌধুরীর কাছে রবিবাসরীয় দপ্তরে অনেকদিন থাকার পর চলে এলেন 'দেশ' পত্রিকায়। তখন থেকেই তিনি বিমল করের সহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত। কবি আনন্দ বাগচীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করত, কবিতা লিখক। তাঁর কবিতায় একদিকে ব্যঙ্গ, জাগতিক অস্তিত্বের বেদনা, ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস বিমল করকে তার কবিতার অনুরাগী পাঠক করে তোলে। আর একজন কবি সুনীল বসুর চেয়েও বয়সে ছোট ছিলেন তিনি তুষার রায়। তুষারের বিখ্যাত কবিতা 'ব্র্যাণ্ড মাস্টার'। একদিন তৃপ্তির ডিউক রেস্টুরেন্টে ঢোকবার সময় সিগারেট খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে একদিকের টেবিলে। তারপর একদিন শোনা যায় সে আর নেই। ডিউক রেস্টুরেন্টের কর্তা ব্যক্তি তৃপ্তি হলেন তাঁদেরই এক পুরোনো বন্ধুর ছোটভাই। হয়তো এখানে সাহিত্যিক আড্ডা বসতো। কিন্তু ব্যবসা ও সাহিত্য চর্চা একসঙ্গে হয় না। তরুণ লেখকদের মধ্যে একজন প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রণবকুমার ছাত্রাবস্থাতেই 'সংগ্রামী যুবক' ছিলেন। একসময় বেঙ্গল পাবলিশার্সের বইয়ের প্রুফ দেখতেন। বিজ্ঞাপন লিখতেন টিউশনিও করতেন নানা ধরণের। তবুও ভালো কবিতা লিখতেন নানা ধরনের। অন্যের প্রুফ, বই প্রকাশের কাজে, পরিশ্রম করলেও তিনি নিজের কবিতা চর্চা অপেক্ষা গান শোনা এবং সমালোচনা শোনায় বেশী সময় দিয়েছেন।

বিমল কর 'দেশ' পত্রিকার অফিসে চাকরি করার সুবাধে অনেক বাংলা পত্র-পত্রিকার খোঁজ খবর পেয়েছিলেন। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে, মফস্বল, যেখানে যতরকম তরুণ লেখকেরা কাগজ বের করেছে তার বেশিরভাগ অংশই 'দেশ' পত্রিকার অফিসের টেবিলে জমা পড়েছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিমল করের কাছে স্পষ্ট যে, শহরের লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে মফস্বলী ছেলেদের দ্বারা প্রকাশিত পত্রিকার মধ্যে পার্থক্যটা কী? এইসকল পত্রিকার ভিড়েই 'এই দশক' নামে একটি শীর্ণ একটি পত্রিকা টেবিলে এসে পড়ে থাকত। এঁদের লেখক গোষ্ঠীর মদ্যে ছিলেন রমানাথ রায়, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ, বলরাম বসাক, কল্যাণ সেন প্রমূখ। এই লেখকেরা 'শাস্ত্র বিরোধী' বলে একটা দল গড়েছিলেন। এই লেখকদের মধ্যে বিমল করের পছন্দসই লেখক — শেখর বসু এবং সুব্রত সেনগুপ্ত। শেখর বসু 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সাব-অডিটার। 'এই দশক' পত্রিকাটি তার হাত দিয়েই বিমল করের কাছে আসত। কিছুটা জোরপূর্বক শেখরবাবু বিমল করকে বলতেন পত্রিকাটি পড়তে। কোনোদিন মুখ ফুটেও বলেন নি তিনি নিজেও একজন লেখক। তবে এই তরুণদের লেখা সম্পর্কে ক্রমেই কৌতুহল বাড়ছিল বিমল করের। সেই তরুণদেরকে একদিন তিনি অফিসে আসতে বললেন। তাঁদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন 'দেশ' পত্রিকায় তরুণ লেখকদের অভ্যর্থনা করতে সম্পাদকের কোনো আপত্তি নেই তবে লিটল ম্যাগাজিনে লেখকদের যতটা লেখার স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব সম্পাদক হিসেবে বিমল করের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ গল্পগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ এখানে কিঞ্চিৎ কম। কারণ লিটল ম্যাগাজিনের মত অতি-সীমিত অতি-সহিষ্ণু পাঠক তো একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের হতে পারে না। শেখক বসু 'দেশ' পত্রিকায় যে গল্পটি লিখেছিলেন, তার নাম 'টাঙ্গি'। যার ফলে তিনি নানা মহলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছেন। এরপর

থেকেই তিনি 'দেশ' পত্রিকায় গল্প লিখেছেন। শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত এবং রমানাথ রায়কে একসঙ্গে দেখলে শিশির লাহিড়ী বলতেন — 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'। এই তরুণদের লেখা আকারে সত্যিই ছোট, বাহুল্যবর্জিত। বয়সে শেখর এবং সুব্রত যথেষ্ট ছোট হলেও এঁদের লেখা সাহিত্য মতামত বিমল করকে যথেষ্ট ভাবিয়েছে। গল্পকার হিসেবে শেখর বসুর আত্মপ্রকাশ বেশিদিনের নয়, তবুও বিগত স্বল্প সময়ের মধ্যেই সচেতন গল্প পাঠকের কাছে তিনি আলাদা জগতের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর গদ্য লেখার ভঙ্গি, স্বতন্ত্র স্টাইল যে কোনো একসময় বাংলা গল্প লেখায় তরুণদের মধ্যে গ্রহণীয় হবে — তা বিমল করের মানস চেতনাকে ভাবিয়ে তোলে। সুব্রত সেনগুপ্তও 'শাস্ত্র বিরোধী' গল্পধারার লেখক। এঁদের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বিমল করের কোনো সম্পর্ক ছিল না ঠিক। কিন্তু তাঁদের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি তাঁর ছিল প্রবল। তবে এই সম্পর্কের মূলেও ছিল তাঁদের লেখা। শেখর বসু সাহিত্যের লেখক হলেও সুব্রত সেনগুপ্ত লেখাপড়া করেছে ব্যাবসা-বাণিজ্য, অঙ্ক, হিসেব — এসকল বিদঘুটে ব্যাপার নিয়ে। বিমল করের অফিসের কাছেই তাঁর অফিস। কাজকর্ম ছিল হিসেবের খাতা দেখাশোনা করা অফিসের মধ্যে সুব্রত হিসেবের খাতা সামনে রেখে লুকিয়ে কাগজে গল্প লিখতেন। এরপর তিনি চাকরি ছেড়ে ওয়েলিংটনের কাছে চাকরি নিয়ে সময় কাটালেন কয়েক বছর। পরে সাংবাদিক হিসেবে 'আজকাল' পত্রিকায চাকরিতে নিযুক্ত হলেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রথম গল্প দল 'টম্যাটো'। শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় এইসময় 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত এসেছেন। তিনি সুব্রত সেনগুপ্তর লেখা 'টম্যাটো' গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেনগুপ্তের একাধিক গল্পের প্রশংসা পাঠক মহলে ছড়িয়ে পড়ে। সুব্রত সেনগুপ্তের প্রথম গল্পগ্রন্থের নাম 'জামা', অপর একটি গল্পের বই বছর বার পূর্বে বেরিয়েছে তা হল 'সব বিক্রির জন্য'। আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায় পাঁচ-ছ বছর আগে একটি উপন্যাস প্রকাশিত — 'এ জীবনের বদলে'। আশিষ ঘোষও এঁদেরই বন্ধু। পেশায় স্কুল মাস্টার। বাংলা পড়াতেন। আশিষ ঘোষের সাহিত্য চর্চা তার অন্যান্য বন্ধুদের মতোই সত্তরের কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছিল। ভীষণ আড্ডাবাজ মানুষ তিনি, দক্ষিণ কলকাতার সমস্ত সাহিত্যিক আড্ডায় তাঁর যাওয়া আসা। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর নেশা ফিল্ম। কলকাতার ফিল্ম সোসাইটির নানা খোঁজ রাখেন তিনি। সাহিত্যের বেলাতেও আধুনিক বিদেশী লেখকের মোটা-সোটা বই তাঁর হাতে আছে। অনেককাল পূর্বে 'গল্প বিচিত্র'-য় আশিষ ঘোষ একটি গল্প লিখেছিলেন 'ভালুক' নামে। যা বিমল করের ভালো লেগেছিল। এছাড়া আশিষ ঘোষের দু'টি গল্পের বই পাওয়া যায় — 'সময়', 'আমি কেন আমি'। এছাড়া শৈবাল মিত্র, রাধানাথ মণ্ডল, লাডলীমোহনও যুক্ত ছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত লেখাগুলি সাহিত্যের ইতিহাস, কারও সাহিত্যকর্মের আলোকে কিংবা কোনো সাহিত্যতত্ত্ব নয়। নিতান্তই বিমল করের সাহিত্যজীবনে স্মৃতির সঙ্গে যেসকল তরুণ লেখকেরা জড়িয়ে রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক মেলামেশার বাণীরূপটিই এখানে গ্রন্থিত হয়েছে। যেখানে আগাগোড়াই তিনি সাহিত্যচর্চার, আড্ডাখানার গল্প, বন্ধুত্বের কাহিনী, পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতির কথাই বলতে চেষ্টা করেছেন। আসলে তরুণ লেখকেরাই ছিলেন বিমল করের আলোচনার বিষয়, লেখার বিষয়। যাঁদের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল, তাদের বাদ দিয়েও যাদের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল না, নিতান্ত বন্ধুগণ হিসেবে তারাও আড্ডায় যোগ দিতেন। স্মৃতির পাতা খনন করতে গিয়ে স্মৃতিমগ্ন গভীর অতীতের শিকড়ে তিনি রোমন্থন করেছেন।

বিমল কর 'এই দশকে গল্প' সংকলনে যেসকল তরুণ লেখকেরা ঐতিহ্য বিরোধী গল্প লিখেছিলেন তাদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দিব্যেন্দু

পালিত, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মতী নন্দী, কবিতা সিংহ, সত্যেন্দ্র আচার্য, প্রবোধ বন্ধু অধিকারী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমূখ। মূলত তরুণ লেখকদের নতুন রীতির লেখাকে উৎসাহিত করতেই বিমল করের এই পদক্ষেপ। কিন্তু পাশাপাশি ১৯৩৩-১৯৮৩ সন পর্যন্ত 'দেশ' সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলনে সাগরময় ঘোষের সম্পাদনায় তিনি প্রকাশ করেছে মোট ৫০টি বাছাই করা গল্প। এই বাছাইয়ের কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সহযোগী সম্পাদক বিমল কর। এই সংকলনে সাবেক এবং নব্য রীতির বিরল সংমিশ্রণ রয়েছে। প্রকাশিত হয়েছিল নভেম্বর ১৯৮৩ সালে। যেখানে বিমল করের 'সুখ', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বনের রাজা' গল্পটি প্রকাশিত। তবে 'এই দশকে'-র গল্প তো কেবল তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ছোটগল্পে : নতুন রীতি' পত্রিকার প্রথমেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটি দিয়ে শুরু। বিমল কর নিজেও স্বীকার করেছেন — ''জ্যোতিদারা ঠিক আমাদের আগের লেখক। মানে, সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের সমসাময়িক তিনি।''[৪] এঁদের আলাদা মর্যাদা দিতেই হয়তো সে সময় 'দেশ' পত্রিকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সুবোধ ঘোষের লেখার পাশাপাশি, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখাও বিমল করকে খুব টানত।

রবীন্দ্রনাথের 'হিতবাদী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটগল্পের প্লট নির্মিত, ভাষাগত ইঙ্গিতময়তা, বিষয়বৈচিত্র্যে যে পালা বদল ঘটিয়েছিল, 'কল্লোল' পত্রিকায় এসে তা দিক পরিবর্তন করেছে ভিন্নস্রোতে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ফ্রয়ডীয় যৌনদর্শন বাংলা ছোটগল্পে প্রবর্তন ঘটিয়েছে বস্তুবাদী রিয়ালিজমের ধারা। ১৯২৯ সালে সজনীকান্ত দাশ সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'-তে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ সালে প্রকাশ পেয়েছিল বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নরকের কীট' গল্পটি। যা ছিল গল্প ভাঙার গল্প, গল্পহীনতার গল্প। 'ছোটগল্পে নতুন রীতি' বাংলা ছোটগল্পে দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি দুষ্প্রাপ্য প্রথম প্রস্তাব। প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রস্তাবক এই নিবন্ধে এডগার অ্যালেন পো, মোপাঁসা, চেকভ ও হেনরী, ভার্জিনিয়া উলফ, ডি. এইচ লরেন্সের গল্প নিয়েও আলোচনা করেছেন। ইতিপূর্বে ছোটগল্প : নতুন রীতি গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়েছে। তবে দুটি গল্প প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধান খুব দীর্ঘ নয়। ইতিমধ্যেই স্বল্প সময়ে প্রচারিত এই গল্পমালার উৎসাহী পাঠক কতগুলি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন —

১। ছোটগল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশে এমন পত্রিকার সংখ্যা বেশি। তবু এই গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য কী?

২। ছোটগল্প : নতুন রীতি বলতে আসলে কী বোঝায়, যথার্থভাবে আমরা কী বোঝাতে চাই?

৩। এই গ্রন্থমালা কি কোনো গোষ্ঠীগত সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলা যেতে পারে, বাংলা ছোটগল্পগুলি যথেষ্ট গল্প পরিবেশন করতে পারছে না, এমন কোনো অভিযোগ নেই। অনেকগুলি পত্রিকার আয়ু যেমন ক্ষীণ হয়ে আসছে, তেমনি কিছু কিছু নতুন পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে। অনুপাতের হিসেব ধরলে হয়তো দেখা যাবে, দশ-বিশ বছর আগে যতগুলি গল্প পড়ার সৌভাগ্য পাঠক সমাজের হয়েছিল এখন তার চেয়ে বরং বেশিই হয়। আর এ দাবীও করা হচ্ছে না যে, এই পত্রিকাগুলিতে পাঠযোগ্য গল্প ছাপা হয় না। সে কারণে কোমর বেঁধে একটি গল্প গ্রন্থমালা প্রকাশে নামতে হয়েছে। আসলে এই পত্রিকাগুলি ছিল ব্যবসায়িক পত্রিকা। সম্পাদকের চোখে ক্রেতারূপ বিধাতার যে ছবিটি থাকে সেটি ছিল সর্বসাধারণের লেখা মনোনয়নকালে ভাবতে হয়, এমন লেখা প্রকাশ করতে হবে যা সাধারণ পাঠককে আনন্দ ও তৃপ্ত করবে। ছোটগল্প ঃ

নতুন রীতির সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তাঁরা সবিনয়ে শুধু এটুকু বলবেন যে তারা নিজেদের মনোমত করে গল্প লিখতে চেয়েছেন। যে লেখাগুলি সাধারণ চলতি পত্রিকাগুলি থেকে সর্বদা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে এই গল্পমালার পাঠক স্বল্প সহানুভূতিশীল এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। এতে যদি অল্প পাঠকই জুটুক, ক্ষতি নেই। ছোটগল্প যখন নিছক ছোটগল্প ছিল, ততকাল পাঠক ছিল শ্রোতা। গল্প যখন থেকে কাব্যের ঐশ্বর্যলাভ করল তখন পাঠক লেখকের অভিজ্ঞতার সাথী হয়ে উঠল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়কালের ইতিহাসে ছোটগল্পকেন্দ্রিক আরও নানা আন্দোলন হয়েছিল। যারা ইস্তেহার সামনে রেখে গল্প লিখেছিলেন এবং যে আন্দোলনগুলি হয়েছিল সেগুলি হল —
হাংরি জেনারেশন শাস্ত্রবিরোধী নিম সাহিত্য গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী আন্দোলন ঘটনাপ্রধান গদ্য নতুন নিয়ম চাঁচ ভেঙে ফ্যালো সমন্বয় ধর্মী গল্প গাণিতিক গল্প থার্ড লিটারেচার।

ছয়ের দশকে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৬২ সালের এপ্রিলে 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রধান পরিকল্পক ছিলেন মলয় রায়চৌধুরী। হাংরি আন্দোলন শুরু হয়েছিল কবিতা চর্চার মধ্য দিয়ে। পরে গদ্য রচনাও যুক্ত হয়। যেখানে আত্মার বান্ধীত্ব থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। অস্তিত্বকে জানতে হবে সবার পূর্বে। সমস্ত রকম মূল্যবোধের ধ্বংস হবে। গতানুগতিক প্রচলিত যা সমস্ত কিছুর বিরোধিতা করা হবে। হাংরি গদ্য আন্দোলনের তিনজনের গদ্যকারের নাম উল্লেখযোগ্য — বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক এবং সুভাষ ঘোষ। এদের গদ্যে নগ্নতা, ক্রূঢ়তা প্রকাশ পেল। শব্দ-ভাষাকে করে তুললেন তীক্ষ্ণধী, খবরের কাগজে হেডিং ব্যবহার করা, বাক্যকে ছোটছোট করে সাজানো, পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার না করা, সাধু চলিত বাক্য পাশাপাশি ব্যবহার করা এদের গদ্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত 'এই দশক' পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। রমানাথ রায় এর প্রধান পরিকল্পক। ১৯৬২ সালে রমানাথ রায়ের সম্পাদনায় 'এই দশক' বুলেটিন প্রকাশ পেয়েছিল। গল্প-কবিতা উভয়ই এখানে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে এই পত্রিকায় যারা কবিতা লিখতেন, তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন শ্রুতি পত্রিকা। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'এই দশক' পত্রিকাটির সংখ্যা ২৪ টি। এই পত্রিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে —

(ক) গল্পে তারা তাদের কথাই লিখবে।
(খ) তারা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।
(গ) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ, আমাদের কাছে নয়।
(ঘ) গল্পে এখনো যারা কাহিনী খুঁজবে, তাদের গুলি করে মারা হবে।

রমানাথ রায় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যের লক্ষণগুলি বলেছেন —

(ক) শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব এবং দর্শনের আমূল উৎখাত।
(খ) যা কিছু এতকাল ছিল গম্ভীর এবং যুক্তিপূর্ণ তাই হাস্যকর।
(গ) শিল্প সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে।
(ঘ) সং-অসৎ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য ইতাদির ধারণা রীতিমত বিরক্তিকর এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। এই শব্দগুলি তাদের কাছে অর্থহীন।
(ঙ) পরীক্ষামূলক সাহিত্য কথাটা নির্বোধের উক্তি। সাহিত্য সৃজন কিন্তু গবেষণাগার নয়।

(চ) মহৎ সাহিত্য বলে কিছু নেই। সাহিত্য নিজের কালের এবং যুগের।

(ছ) গল্প উপন্যাস থেকে পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক সমস্যা, অপ্রেম, মনস্তত্ব, ভাবুকতা বুদ্ধিমত্তাকে বর্জন করতে হবে।

(জ) সাহিত্যে সেকেলে কার্যকারণবাদকে বর্জন করা হোক।

(ঝ) সাহিত্য দীর্ঘদিনের সংস্কারবদ্ধতা থেকে মুক্ত হোক প্রচলিত শাস্ত্রীয় শিল্প-সাহিত্যের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল। গল্পের বলার রীতির বিরুদ্ধে। এদের গদ্যগুলি ছিল অনেকটা ছবির মতো। এই গোষ্ঠীর নিয়মিত গল্পকার ছিলেন আশিষ ঘোষ, অমল চন্দ, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, কল্যান সেন, সুনীল জানা, শেখর বসু, বলরাম বসাক প্রমুখ।

১৯৭০ সালে দুর্গাপুর শিল্পনগরীতে কলকারখানার একদল কর্মী যুবক রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু সেন এবং মৃণাল বণিক প্রমুখরা এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আন্দোলনগুলি কলকাতা নগরকেন্দ্রিক হলেও এই আন্দোলনটি সংগঠিত হয়েছিল কলকাতা থেকে দূরে শিল্পাঞ্চলে ১৯৭০ এ ৩রা ফেব্রুয়ারি 'নিম সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পত্রিকাটি হয়েছিল ৩ এ / ৪৯ রামকৃষ্ণ এভিনিউ থেকে। সম্পাদক হিসেবে ছিলেন সুধাংশু সেন এবং বিমান চট্টোপাধ্যায়। যদিও পত্রিকাটির মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নকশা রচনা, ক্যাপসন্‌স বিষয়গত নির্বাচনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র গুহর ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। দূর্গাপুরের মতো শিল্প নগরী অঞ্চলে যেখানে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন সক্রিয়, ট্রেড ইউনিয়ন অটুট সেখানে নিম সাহিত্য সম্পূর্ণ আলাদা রকমভাবে নিজের পরিচিতি ঘটালো। এই পত্রিকার শিরোনামে লেখা থাকত — ''না সাহিত্য, অল্প সাহিত্য তিক্ত বিরক্ত সাহিত্য।" এখানে বলা থাকত —

(ক) সাহিত্য কোনো অভিজ্ঞতার ফল নয়, অবিকৃত অভিজ্ঞতাই হল সাহিত্য।

(খ) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ইশারার মাধ্যমে প্রতিফলন।

(গ) না সাহিত্যে গোপনতা চতুরতা বলে কিছু নেই।

এরা 'নিমসাহিত্য' প্রসঙ্গে বলেছেন —

(ক) লেখকের লেখনী মূল থেকে কখনো বেরোয় তিক্ত বাস্তবতার স্থূলতা কখনো ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভাষা জীবনকে চিনিয়ে দিয়েছে।

(খ) জীবনের কোনো ব্যাখ্যা নেই। যাবতীয় স্থাবর দুর্ঘটনাই হল নিম সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের কোনো ঐতিহ্য নেই।

(গ) নিম সাহিত্যে গদ্য ছন্দ বলে কোনো কথা নেই। যা কিছু সংক্রমিত অগ্নি-গরল-রক্ত-প্রেম সাহিত্যের শরীরে খোদিত করা হবে। নিম সাহিত্যের গদ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন — সুধাংশু সেন, রবীন্দ্র গুহ, অরুনেশ ঘোষ, বিমান চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল বণিক, উদয়ন ঘোষ, বারীন ঘোষাল, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, অজার নন্দী, নৃসিংহ রায়, প্রিতম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ (১৯৭০ মে) ২৩ এ পূর্ণ মিত্র প্লেস কলকাতা ৩৩ ঠিকানা থেকে 'গল্প' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সুব্রত সেনগুপ্তের সম্পাদনায় এবং প্রকাশনায়। শাস্ত্রবিরোধী গদ্যকার হিসেবে সুব্রত সেনগুপ্ত পূর্ব পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সমকালীন এবং পরবর্তী প্রচলিত গল্পের বিরোধীতা করে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি হল - গল্প, নতুন-নিয়ম, অব্যয়, নির্মিত, কৌস্তুভ, অক্ষর, চোখ, অধুনা সাহিত্য, গল্পপত্র, চিল, ঈগল ইত্যাদি। 'গল্প' পত্রিকার

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছেন —

''সাহিত্য ক্রমশঃ চাকরদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। এদের কেউ রাজনীতির আবার কেউ রাজনীতির আবার কেউ বক্তব্যের চাকর। আমরা চাই সাহিত্যকে চাকরদের হাত থেকে মুক্ত করতে। আমাদের পত্রিকা সাহিত্যকে মুক্ত করার এই আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠুক। কিন্তু সাহিত্যকে আমরা কোনো কিছুর হাতিয়ার করতে চাই না।'' সেইসময় চাকর সাহিত্য উচ্ছেদের জন্য প্রকাশ পেয়েছিল 'গল্প' সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটির তৃতীয় সংখ্যায় সুকুমার ঘোষ — ''লেখক কী দিতে পারে পাঠক কী চাইতে পারে।'' আলোচনায় জানিয়েছেন — তারা নতুনত্বের অভিযাত্রী, পুরনো গল্পের তুলনায় এর গঠন হবে পৃথক। গল্পে মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটন ঘটনার আদি অন্ত বাদে পাঠকের বিনোদনের জন্য ঘোরালো স্থূল অনুভূতিকে উস্কে দেওয়া হয়েছে।

কাহিনীকে প্রশ্রয়ের পরিবর্তে কার্যকারণ পরম্পরা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। গল্প থেকে যতটা সম্ভব চরিত্র বর্জন করা হয়েছে। চরিত্র কিন্তু সরাসরি কাহিনীর দায় ভাগ গ্রহণ করে না। 'গল্প' পত্রিকার লেখক ছিলেন — পার্থ গুহবক্সী, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস মুখোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর নন্দী, তাপস চৌধুরী, সমীর কান্তি বিশ্বাস, হেমন্ত প্রধান, প্রিয়ব্রত বসাক, সুকুমার ঘোষ, অতীন্দ্রিয় পাঠক, সুনীল জানা, বলরাম বসাক, সুবিমল মিশ্র, সুব্রত নিয়োগী প্রমূখ।

সাতের দশকের সূচনালগ্নে 'এবং নৈকট্য' পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন অচিন্ত্য কুমার সাঁতরা। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই ধারার 'এবং নৈকট্য' পত্রিকা গোষ্ঠী এই গদ্য আন্দোলন চালিয়েছিল। ৭০ বসাক বাগান পাতিপুকুর কলকাতা ৪৮ থেকে প্রকাশিত। গল্পলেখার গতানুগতিক ধারাকে এরা স্বীকার করেন নি। এঁদের মত অনুসারে গল্প বানানো হয়ে থাকে। লেখক কীভাবে গল্পের চরিত্রের উপভোক্তা হবেন? গল্পের পরিবর্তে এরা ঘটনা শব্দটিকে ব্যবহারে উৎসাহী। এরমধ্যে চিন্তার টানাপড়েন ইঙ্গিতময়তার প্রসঙ্গ থাকে না। কারণ শুদ্ধ ও নির্বিকার ঘটনার কাছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত যেন প্রায় একাকার। ঘটনাগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক দেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে গল্প গপ্পো বড়ো গল্প ছোট গল্প ঘটনা' আলোচনা ('এবং নৈকট্য' ২ বর্ষ, মে ২য় সংখ্যা অক্টোবর ১৯৭২)। ঐ সংখ্যায় লেখকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল 'মানুষের জীবনকে নিয়ে কতদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নাম করে গপ্পো ফাঁদবেন? আর কতদিন সহানুভূতির ন্যাকা মুখোশ পরে স্যাণ্ডউইচ খেয়ে থুতু দিয়ে চোখের পাতা ভেজাবেন?'' এই সকল লেখকরা গতানুগতিকতার গদ্য ভাবনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি। দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এক্ষেত্রে জানিয়েছেন — (ক) এতদিন ধরে সনাতনী সাহিত্যের মাটিতে চরিত্রের সংলাপ গতি মনোভাব সবকিছুই হয়ে চলেছে। তাই আর দেবতাইজম নয়। এর কারণ লেখক অন্যকিছু নন। আর পাঁচটা মানুষের মতো তিনিও সাধারণ মানুষ হয়ে পাঠকের মুখোমুখি কথা বলতে হবে।

(খ) রবীন্দ্রপর্বে দাঁড়িয়ে বিচ্ছিন্ন প্রকাশবাদের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্ব।

(গ) তিরিশের দশক পর্বে অস্তিত্ববাদের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সমান্তরাল অবস্থান প্রতীকের উপর নির্ভরতা।

(ঘ) চল্লিশের দশকে বাস্তববাদীদের পরিপূর্ণ অবয়ব।

(ঙ) পঞ্চাশের দশক পর্বে কাব্যের মেজাজ এবং সুররিয়ালিজমর প্রভাব।

(চ) জীবন জটিলতার সঙ্গে ব্যক্তির অন্তর্মুখীনতার উন্মোচন ষাটের দশক পর্বে প্রাধান্য পেতে থাকে। সমস্ত রকম গল্পত্বকে সরিয়ে 'Anti Story' -কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবং নৈকট্য পরিত্রকার ২ বর্ষ ৪ র্থ সংখ্যা এপ্রিল জুন ১৯৭৩ এর শেষ প্রচ্ছদের এক ইস্তাহারে এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য তুলে

ধরা হয়। যেখানে বলা হয়েছে 'কেন গল্প নয় — শুধু সাহিত্যাশ্রয়ী ঘটনা, কেন কেউ নয় — শুধু আমি।' আসলে 'আমি' হল আমরারই এক জটিল মানসিকতা। লেখার মধ্যে সাবজেকটিভ এক ভূমিকার আবির্ভাব। ঘটনার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল বিষয়ের নিরপেক্ষতা। একারণে প্রকৃত ঘটনার মধ্যে মনস্তত্ব, ধর্মীয় আচরণ, রাজনীতি, ন্যায়নীতি, দার্শনিকতা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সমস্তরকম 'গল্প'-কে সরিয়ে নিয়ে বিষয় নিরপেক্ষ ঘটনার উল্লেখ করা। যেখানে অত্মমগ্নতা, সৌন্দর্য, সত্যতা বিদ্যামান থাকবে। এই গোষ্ঠীর মূল গদ্যকার ছিলেন — অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা, সুভাষ গুহ রায়, দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম ঘোষ, ঘনশ্যাম দাস প্রমূখ।

নতুন নিয়ম গদ্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৭৮ সালে 'নতুন নিয়ম' পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে ছিলেন আশিস মুখোপাধ্যায়। ঠিকানা ১৬/৫ ডোভার লেন ফ্ল্যাট -এ ২৩ কলকাতা ৭০০০২৯। 'নতুন নিয়ম' এর গদ্যরীতি প্রসঙ্গে এই পত্রিকার ৬ সংক্যাটি বিশেষভাবে (এপ্রিল ১৯৮১) দ্রষ্টব্য। এই সংখ্যায় ৪টি নিবন্ধ যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন — তাপস চৌধুরী, তীর্থঙ্কর নন্দী, পার্থ গুহবক্সী ও আশিষ মুখোপাধ্যায়। এক্ষেত্রে বলা যায় তাপস চৌধুরীর 'নতুন নিয়ম কেন' এই নিবন্ধ অনুসারে বক্তব্যের সারকথা হল —

(ক) পুরনো কোনো নিয়মকে আশ্রয় করা যাবে না। যাকে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃজন অসম্ভব।

(খ) গল্পে কাহিনী বা প্লট আর থাকবেনা।

(গ) গল্প হবে শব্দ-নির্ভর। শব্দই বর্তমানে ছোটগল্পের প্রধান উপকরণ। কাজেই শব্দচয়ন, শব্দস্থাপন, শব্দগঠনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়।

(ঘ) শব্দই নির্দেশ দেবে চরিত্ররা কোথায়, কীভাবে কখন দাঁড়াবে থামব এমন কি কথা বলবে।

(ঙ) গল্পে কাহিনীর পরিবর্তে বিষয় শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

(চ) তত্ত্ব প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে গল্পকে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(ছ) অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচন করাই এর প্রধান কাজ। আসলে নিয়মানুগ সাহিত্য তাদের কাছে সাদা কাগজ ছাড়া কিছুই নয়।

(জ) এই আন্দোলনের লেখকরা নিয়ম বিলোপ করার সমার্থক।

(ঝ) নিজস্ব মানসিকতা অনুসারে অর্জন করতে নিয়ম বর্জন করা প্রয়োজন।

(ঞ) যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বস্তুকে বিশ্লেষণ করা দরকার। নিয়ম নিষ্ঠ জীবন যাপনের পরিবর্তে তাদের নতুন পরিচয় খুঁজতে হবে।

(ট) মনের ভাবকে হুবাহু প্রকাশ করার মত ভাষা তৈরী হয় নি। কাজেই লেখবার সময় প্রতিটি শব্দকে নবরূপে ব্যবহার করা শিখতে হবে।

(ঠ) এই নতুন নিয়ম সমস্ত রকম চিন্তার জাল ছিন্ন করে চিন্তার স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দেয়।

এ প্রসঙ্গে 'নাতিদের গল্প' নিবন্ধে তীর্থঙ্কর নন্দী বলেছেন — ''... বছরের শেষে আমরা প্রত্যেকেই নতুন দেওয়াল পঞ্জী দেওয়ালে ঝোলাবার জন্য ছটফট করতে থাকি। পুরোনো পঞ্জী আমাদের কাছে তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। নিয়ম মতো নতুন পঞ্জীকেতে আমরা চোখ রাখি। নতুন পঞ্জীতে আমাদের ক্ষোভ থাকে না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

অথচ সব নিয়ম জানা সত্ত্বেও আমরা কখনও সাহিত্যের নতুন 'আমি'-তে স্বাভাবিক হতে পারি না। পুরোনো 'আমি' তখনও আমাদের মনে মনে শোভা পেতে থাকে। ... সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিবর্তনকে

অস্বীকার করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'রাও যে বদলায় কখনও বুঝতে চাই না।"[৫]

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে এই শিরোনামে লেখা একটি নিবন্ধে (দ্রষ্টব্য, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৭৫) অমল চন্দ জানিয়েছেন যে, ''কোনো সমস্যা নিয়ে গল্প লেখার দিন আর নেই, কিন্তু গল্প লেখার সমস্যাটা আছে, থেকে যাবে। ইচ্ছে হলেই একটা গল্প ফাঁদা চলে গল্প লেখা চলে না। দ্বিতীয়টা নিয়েই সমস্যা, প্রথমটা ছাঁচে ঢালা। ছাঁচে ঢেলে দিলে প্রথমটা হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টার বেলায় কোনো ছাঁচ নেই বলেই ভাবতে হয় কেমন করে লিখব।" [৬] 'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো' নামে পত্রিকাটি অমল চন্দ প্রকাশ করেছিলেন ৭৪০ শরৎ চ্যাটার্জী রোড, হাওড়া ৪ ঠিকানা থেকে অক্টোবর ১৯৭৯ সাল। প্রথম বর্ষ প্রথম সংক্যার প্রচ্ছদে বলা হয়েছিল উক্ত পত্রিকাটি চার মাস পর পর প্রকাশিত হবে। এর কাজ হল উপন্যাসের আন্দোলন বা উৎপাত। এই উৎপাতের সূচনা হয়েছিল অমল দত্তের উপন্যাসের মধ্য দিয়ে।

অজিত দেব এবং সুধীর দাস ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ৮/৯ মহাত্মাগান্ধী রোড কলকাতা ৯ থেকে সমন্বয়ধর্মী গল্প নামে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই সংখ্যায় সুবীর দাসের তিনটি গল্প এবং অজিত দেবের তিনটি গল্প প্রকাশিত। গতানুগতিক গল্পধারার বিপরীতে এই আন্দোলন চলমান। এই পত্রিকার পেছন মলাট থেকে এঁদের বক্তব্য তুলে ধরা হল —

(ক) এই ধরণের গল্প আদি-মধ্য-অন্ত নিয়ে নির্মিত কোনো গল্প নয়।

(খ) এই ধরণের গল্প প্রচলিত শিল্পগুণ সম্মত যে হবে, তাও নয়।

(গ) এই ধরণের গল্পগুলি প্লটলেশ, দীর্ঘ সংলাপহীন, শুধুমাত্র অনুভূতির উপর নির্ভরশীল, তাও নয়।

(ঘ) সমন্বয়ধর্মী গল্প হবে সমস্ত রকম সংস্কার মুক্ত মননঋদ্ধ।

জানুয়ারী মাসে ১৯৮০ তে 'ছয়' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এই গল্প আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। কলেজে পড়াশুনা চলাকালীন গণিত বিভাগের ছয় ছাত্রের সান্নিধ্যে এই প্রতিরকা প্রকাশিত হয়েছিল ২২২ ব্লক বি। বাঙ্গুর এভিনিউ কলকাতা ৫৫ থেকে। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লেখকগণ হলেন — চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, প্রবুদ্ধ ভট্টাচার্য, অনুপ সেনগুপ্ত, মানস বসু, অরিন্দম দাস, ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্ত প্রমূখ। গাণিতিক সাহিত্যের মুখপাত্র হিসেবে 'ছয়-৬' প্রকাশিত হয়েছিল।

মুখপত্র হিসেবে 'কবিপত্র প্রকাশ' সম্পাদনা করেছেন পবিত্র সরকার ও শৈবাল মিত্র। এর পূর্বনাম কবিপত্র। পঁচিশ বছরে পা দেওয়ার মুহূর্তে কবিপত্র থার্ড লিটারেচার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করল। সাহিত্যে ইস্তাহারের মাধ্যমে বিষয়টিকে তারা যুক্ত করলেন। ১৯৮৩ জুলাই মাসে 'কবিপত্র প্রকাশ' পত্রিকার সংখ্যায় থার্ড লিটারেচারের গল্প সম্পর্কিত 'অঙ্গীকার' প্রকাশ পেয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছিল —

(ক) বিশুদ্ধ শিল্প কোনো শিল্পই নয়, সুবিধাবাদী সাহিত্য-ব্যবসায়ীর কৌশল মাত্র। তারা মনে করেন তাদের গল্প শিক্ষিত সচেতন অনুভূতি প্রবণ মনে মানুষের চলমান কাল এবং আবহমান জীবন সম্পর্কে বোধের জন্ম দেবে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তারা প্রয়োগবাদী এবং এই উপলব্ধিটি সম্ভব করতে না পারলে তা হবে ব্যর্থতা। নিছক আনন্দ দান করাও সাহিত্যের কাজ নয়।

(খ) অপ্রয়োজনীয় ভাবাবেগ বর্জন করে বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে স্পষ্টতা বেং বোধগম্যগত বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়। এই বোধগম্যতার আলোকে জীবনকে দেখবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে। তবে এই বৈজ্ঞানিক দর্শন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়মাত্র। প্রকৃতির মতো জীবনও অনেক বড় বিষয়। আবার

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে গল্পকার নিজের জীবনবীক্ষণ অন্তদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন।

জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ই শিল্পের উপকরণ হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন হলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি নির্ণীত হতে পারে। সেইসঙ্গে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টাও থাকবে। এসকল বিষয় সহজভাবে উপস্থিত করার জন্য প্রয়োজন গদ্যরীতির সচল ব্যবহার সেইসঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে নন্দনতত্ত্বগত উৎকর্ষতাকে।

(গ) গল্প উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কোনো অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-পাঠকের সঙ্গে বিনিময়ের একটা মাধ্যম। কিন্তু সেকেণ্ড লিটারেচারের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে তত্ত্বের ছাঁচে জীবনকে ঢালাই করবার প্রণালীকে তারা বিরোধীতা করেছেন। দ্বিতীয় সাহিত্যের ছকের দ্বারা আক্রান্ত লেখকেরা বাস্তবকে অস্বীকার করেছেন। তার পরিবর্তে এমন এক গোল তাল কাহিনী নির্মাণ করেন যেখানে জীবনাধর্মিতা নেই। বাস্তবতার পটভূমিতে ঘটনাকে রেখে, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে উপস্থিত করতে পারার ক্ষমতা একমাত্র তৃতীয় সাহিত্যের গল্পকারেরা অর্জন করেছেন। একথা স্বীকার করে নিতে হবে লেখনিচর্চা নিছক প্রমোদ সামগ্রী নয়, ঠিক তেমনি ভাবে শিল্পকে অস্বীকার করে কেবল সংবাদ চর্চাও সাহিত্য নয়।

(ঘ) গল্পের ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য বিষয় হল লেখকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর শৈল্পিক চোখের জীবনবীক্ষা। তৃতীয় সাহিত্যের মতে, একজন রূপদক্ষ গল্প লেখকের ক্ষেত্রে সাহিত্য রচানার প্রয়োজনীয় মাপকাঠি তার বিষয়বস্তু। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আঙ্গিকের সচেতন চর্চার মধ্য দিয়ে লেখক পাঠককে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন। কতটা পরিমাণ গভীর তার বিষয়, চিন্তা এবং বিশ্লেষণ। অনেক ননসেন্স, অর্থহীন বিষয় নিয়ে গল্প লেখা অথচ আঙ্গিকের বিচারে উত্তীর্ণ গল্প শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে লেখা হয়েছে। কিন্তু থার্ড লিটারেচারের লেখকেরা এর তীব্র বিরোধীতা করেছেন। তাঁরা বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আঙ্গিক ব্যবহারে সমানভাবে সচেতন। আসলে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে জীবন এবং ইতিহাস সচেতনতার সত্য এবং দ্বন্দ্বগুলির প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিধি ও অভিরুচি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(ঙ) 'আধুনিক মনন' সমৃদ্ধ লেখা হল যথার্থ 'আধুনিক' লেখা। থার্ড লিটারেচারের সঙ্গে নিযুক্ত লেখকজন যথেষ্ট মননশীল, বিষয় সচেতন, উদ্দেশ্যনিষ্ট হবেন। সমকালীন বাংলা গল্প-উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিবরণ পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে প্রচলিত ধারায় মননশীলতার অভাব অনেক বেশী। মননঋদ্ধতায় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখা যায় রোদলেয়ার, মালার্মে, রিলকে, টি. এস. এলিয়ট, প্রমুখের পাশাপাশি ডস্টরভস্কি, কামু, কাফকা, জেমস জয়েস সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। যাদের জীবনদর্শনের গভীরতা অনেক বেশি। বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে মননহীনতার জন্য দায়ী কাহিনীকথন বলে যাওয়ার প্রবণতা। শেষে ভাষিক টেকনিকে ব্যঞ্জনা এনে দেওয়ার প্রয়াস, যার অর্থ তারা নিজেরাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

(চ) বৃত্তধর্মী কাহিনী বলবার প্রবণতা ত্যাগ করে যে ঘটনা স্বাভাবিক তাকে স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটতে দিতে হবে। লেখকের এক্ষেত্রে কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কাহিনীর নির্যাস ব্যবহার করে তাকে আনস সূত্রে রেখে বিষয়কে মূর্ত করে তুলবার কোনো বিশিষ্ট গদ্যরীতি আয়ত্ব করার প্রয়াস চালাতে হবে। বিষয়বস্তু নির্মানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে প্রাত্যহিক বাস্তব অভিজ্ঞতা।

(ছ) আঙ্গিকের সচেতন অনুশীলন চর্চা গল্পকারকে খুঁজে নিতে সাহায্য করবে তার নিজস্ব গদ্যরীতির

টেকনিক। এই আঙ্গিকের ক্রমাগত ভাবনা চর্চার মধ্য দিয়েই একজন শিল্পীর রূপদক্ষতা গড়ে ওঠে। যাকে বলা হয় 'Craft'। থার্ড লিটারেচার বিষয় এবং আঙ্গিকের সম্পর্কহীনতা স্বীকার করেনা বরং অপরিহার্যতার প্রতিই বেশি। তবে একথা মনে রাখতে হবে আঙ্গিকচর্চার অর্থ বিষয়টিকে অনর্গল জটিল করে তোলা নয়। যুগের নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করা। সেই সঙ্গে উপস্থাপনার কৌশলও আয়ত্ব করা প্রয়োজন।

(জ) টাইপের এক্সপেরিমেন্ট, উচ্চকিত চমক এবং শ্লোগান ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করতে হবে অথবা সতর্ক থাকতে হবে।

(ঝ) থার্ড লিটারেচারের গল্পকাররেরা অবশ্যই অতি বিদ্বান হবেন।

সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব, বিষয় ও আঙ্গিকের ক্রমবর্দ্ধিত ইতিহাস, সেইসঙ্গে ভারতীয় সমাজ, দর্ম দর্শন, লোকশিল্প, আচার অনুষ্ঠান, জীবনযাপন পদ্ধতি — এগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। থার্ড লিটারেচারের বিশ্বাসী গল্পকারেরা একজন গবেষকের তথ্যনিষ্ঠা এবং শিল্পীর সৌন্দর্যবোধের আদর্শ সমন্বয়ে নিজেদের জীবন-বীক্ষা গড়ে তোলেন। একজন লেখকের মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঠক বোকা নন। এদেশের মানুষের মজ্জার গভীরে লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং রসবোধ স্তরের। গল্পের বিষয়বস্তু যেখানে জটিল, গল্পও সেখানে জটিল হতে বাধ্য। থার্ড লিটারেচারের কবিতার ইস্তাহারের সঙ্গে গল্পের ইতিহাসের এখানেই পার্থক্য। দুটি পৃথক শিল্পরূপকে একরকম হতে হবে এরকম ভাবনার কোনো অবকাশ নেই। কারণ থার্ড লিটারেচার হল একটি বিশেষ দর্শনের আলোকে গড়ে ওঠা সৃজনশীল কর্ম। কিন্তু সমকালীন সাহিত্য মননহীন নিবোধযুক্ত লেখকের একপ্রকার আড্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে তা সরলীকরণের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে প্রতিবাদী কথাসাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

(ঞ) থার্ড লিটারেচার সমাজভিত্তিক গল্প নির্মানের ক্ষেত্রে দাবী করে আবেগ বা শ্লেষ নয়, বরং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। লেখক তাঁর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কুফল, মূল্যবোধহীনতা এবং অবক্ষয়কে প্রয়োগবাদী কৌশলে তা উন্মোচন করবে শিল্পরূপের অবয়বকে অস্বীকার না করে। তবে সুররিয়্যালিজমের শিকড় অনুসন্ধান এই আন্দোলনের একটি প্রেক্ষাপট হিসেবে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুবাদী জীব পদার্থ বিদ্যা, জীব-রসায়নের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই আন্দোলন অস্বীকার করে না।। অর্থাৎ নতুন কিছু করার প্রবণতাকে এরা সাধুবাদ জানায়। থার্ড লিটারেচরে বিশ্বাসী লোকের বিষয়বস্তু মনস্তত্ত্ব-নির্ভর হবে কিনা কিংবা তার লেখায় দর্শনচিন্তা কীভাবে থাকবে তা অপেক্ষা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে বাস্তবতার প্রশ্ন অবশ্যই থাকবে। তবে এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, চারিদিকের ঘটে যাওয়া ঘটনা বিবৃত করে যাওয়াই বাস্তবতা নয়। তা 'অ্যাবসট্রাকশান্' -এর মাত্রা নিয়েও আসতে পারে।

আবার মনস্তাত্ত্বিক এবং দর্শন নির্ভর গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে লেখকদের চিন্তনের ভিত্তি যদি 'Stream of Consciousness Method' ব্যবহার করেন ষাটের দশকে 'কবিপত্র' যে ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা ক্ষণস্থায়ী হলেও তার ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সমকালীন কিছু গল্পকার। সেই সময় কিছু উল্লেখযোগ্য এবং অপঠিত গল্প-উপন্যাস এই পদ্ধতিতে সৃজিত হয়েছিল।

'আনন্দবাজার' পত্রিকার শনিবার ১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে একটি লেখা বেরিয়েছিল। জীবনে তিনি পাঠকের সমাদর তিনি পাননি। স্বাভাবটি ছিল ভীষণ চাপা। বই বিক্রি না হওয়ার একপ্রকার অতৃপ্তির আগুন নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে এত সৃজনশীল লেখা লিখলেন কী করে। মৃত্যুর পূর্বে নিজের স্বামী সম্পর্কে এমনটাই লিখে গেছেন পারুল নন্দী। একপ্রকার অতৃপ্তির

আগুন, সেইসঙ্গে চূড়ান্ত নিরাসক্তি। সাফল্য এবং ব্যর্থতা উভয়ের প্রতি নিরাসক্তি। এই নিরাসক্তিই তাঁর জীবনের চালিকা শক্তি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী লিখেছেন — ''যুগটা বড় বেশি মুখর। অনেক কাগজ অনেক পাঠক অনেক মতবাদের সামনে আপনাকে অহরহ দাঁড়াতে হচ্ছে। ... একই সময়ে নিন্দা প্রশংসার ঝড়ের সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। ... শিল্পীর জীবনে এ এক অভিশাপ। আবার পরীক্ষাও। আমি তাই মনে করি। পরীক্ষা হচ্ছে শিল্প তাঁর নিজের সৃষ্টি ক্ষমতার উপর অকাট্য বিশ্বাস রেখে তাঁর পরবর্তী রচনায় হাত দিচ্ছেন কিনা। ... প্রত্যয়ের হাত শক্ত করে ধরে হাজার রকম মতামতের ঢেউয়ের উপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শিল্পীর আর কিছু করার আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না।'' [৭] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখায় গন্ধের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব লক্ষ্যনীয়। সাদামাটা খুব, অথচ তিনি নিজেই যেন ঘড়ি। বিলাসিতা নেই, বন্ধুবান্ধব নেই, আড্ডা নেই, অহেতুক সময় নষ্ট নেই। অন্তর্মুখী অথচ স্পষ্টবক্তা। তাঁর মননে সূক্ষ্ম রসবোধ রয়েঞ্চে। যাঁরা জ্যোতিরিন্দ্রকে কাছ থেকে দেখেছেন, তাদের কাছে তিনি সেভাবেই ধরা দিয়েছেন। সাদামাটা জীবনে নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁর প্রাণশক্তি। পারুল নন্দীর স্মৃতিচারনা অনুযায়ী — ''লেখার সময়ও ছিল অত্যন্ত বাঁধা। যখনই মনে হল তখনই লিখতে বসলাম একদম পছন্দ করতেন না। যখনই মনে হল রাতে বাড়ি ফিরলাম একদমই পছন্দ করতেন না। আমার স্বামী নিজেই ঘড়ি হয়ে যেন নিজেকে এবং সেই সঙ্গে সংসারটিকে চালনা করতেন।'' [৮] এক্ষেত্রে দীপঙ্কর নন্দীও তীর্থঙ্কর নন্দী দু'জনেই বক্তব্য রেখেছেন — ''শুধু লেখা নয়, তাঁর মতো এক জন ডিসিপ্লিনড মানুষ আমরা সারা জীবনে দেখিনি। স্নান-খাওয়া, বই পড়া থেকে শুরু করে লেখা, এমনকি, বাজার করাও ছিল ঘড়ি ধরে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কী, তা তিনি জানতেন না।'' [৯] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পুত্র তীর্থঙ্কর নন্দী বলেছেন, ''বাবার সঙ্গে লেখা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছি। তিনি কথা শুনেছেন মন দিয়ে। মনঃপুত না হলে তখন নিজের মতটা বলেছেন।'' [১০] আসলে নিজের বাবার কাছ থেকে মুক্তমনা সংস্কৃতির যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হননি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

এই পর্বের গল্পগুলিকে সময়গত কালপরিসরের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হল। এই সময়ের গল্পগুলির মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন অভিজ্ঞতার বহুমাত্রিক রূপ ও জীবন জিজ্ঞাসার আর্তি প্রতিফলিত হয়েছে অনবদ্য ঢঙে। আধুনিকতার রূপকে আঁকতে গিয়ে তিনি ঐতিহ্যবিচ্ছন্ন বাস্তবতার বিশাল প্রেক্ষিতকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন উত্তর আধুনিক স্টাইলে। পাঠকও উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়েছে আসলে প্রকৃত বাস্তবতার পরিচয়টা কী?

রাবীন্দ্রিক ছোটগল্প আঙ্গিকে, শব্দচয়নে, ভাষাগত ব্যঞ্জনায়, রীতিগত গঠন কাঠামোতে, অন্তর্বস্তুর বয়নে যে প্রয়োগগত কৌশল নিরীক্ষণ করা গিয়েছিল তা পরিবর্তনশীল সময়ের নিয়ম মেনে চল্লিশের দশকের বিপরীতগামী স্রোতে পাল্টাতে থাকে। এই দশকের গল্পের ভাষারীতি, অন্তর্বস্তুর বয়ন কৌশল, প্রতীকধার্মিতা, চিত্রকল্পের প্রয়োগ, গল্পের আদ্যপান্ত কার্যকারণ পারম্পর্যহীনতা, গল্পহীন গল্প যোজনা ঘটনা বর্জিত প্রচলিত কাহিনী সংযোজন, এমনকি ফর্ম চেতনার রূপ বদলাতে থাকে। প্লট নিয়ন্ত্রিত গল্প এবং প্লটের অন্তর্গত গল্পে নাটকীয়তার রূপ পরিবর্তন, পরিবর্জনের রীতি পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে। তবে প্রসঙ্গত, ছোটগল্পের যথার্থ সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত করেছেন 'সোনার তরী'-র 'বর্ষাযাপন' কবিতার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ছোটগল্পকে ছোট হতে হবে, সমাপ্তিতে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা থাকতে হবে। তবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক গ্রন্থে ছোটগল্পের দৃষ্টান্তমূলক সংজ্ঞা বিবৃত করেছেন — ''ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যকাহিনী। যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।'' [১১] অর্থাৎ একক প্রতীতি-ই হল ছোটগল্পের

একমাত্র অবলম্বন। সেই সঙ্গে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বিক আর্ত-অস্তিত্বকে প্রতিকায়িত করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল পর্যন্ত এই লক্ষ্যই ছিল ছোটগল্পের প্রধান অবলম্বন এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ ধারার শ্রেষ্ঠশিল্পী। তবে এক্ষেত্রে পাঠকের মনে প্রশ্ন হতেই পারে, বাংলা ছোটগল্পে বাঁক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গ্রন্থমালার প্রয়োজনীয়তাটি ঠিক কোথায়? এর যথার্থ মননশীল অর্থ নতুন কোন সাহিত্য গোষ্ঠী বা সাহিত্য আন্দোলনকে মুখপত্র হিসেবে বিবৃত করেছে। বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত ব্যাবসায়িক পত্রিকাগুলিই কেবল পাঠকের গল্পরচনায় মুখরোচক কতগুলি বিষয়বস্তুর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে গল্প বুনেছেন। সর্বসাধারণকে তৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যই যে উক্ত গল্পের অবচেতনে ক্রিয়াশীল অনুরণন তোলে। এসকল লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে পাঠক সমাজের কাছে তা যাতে তৃপ্তিদায়ক হয় — তা খেয়াল রাখতে সম্পাদকের বিরক্তি ও ক্লান্তি বোধ অনুভব হয়। অনেক সময় দেখা যায় ভিন্ন স্রোতের গল্পে প্রশংসা এলেও ধিক্কারের প্রবণতা এসে পড়ে অনেক বেশী। কিন্তু 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, তারা আপন মর্জির মালিক। যেখানে পাঠকের নয়, লেখকের ব্যক্তিগত অভিরুচিই মুখ্য। নিজস্ব শিল্পী সত্তায় তাঁরা অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সহানুভূতিশীল মানবিক বক্তব্যকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই নতুন শ্রেণির লেখকেরা বাঙালী পাঠক সমাজের মর্জি, রুচি, ইচ্ছা অনুসারে গল্প বুনতে রাজী নন। তারা নিজস্ব রীতির পন্থা অবলম্বন করবেন। তাতে তারা জনপ্রিয়তার শিরোপা অর্জন না করুক ক্ষতি নেই। এই রীতির গল্পগুলিতে কতগুলি বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব, টেকনিক নতুনত্ব ধারাটির অভিনব দিকটিকে পাঠক সমাজের কাছে তুলে এনেছে। সেগুলি হল —

(ক) ছোটগল্পকে ছোট হতে হবে এবং গল্পের আবরণ পড়াতে হবে — এধরণের প্রচলিত ধারণায় তাঁরা বিশ্বাসী নয়। আসলে লেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটালে শিল্পের শিল্পত্ব ক্ষুন্ন হয়। তাই প্রচলিত তত্ত্বের প্রতি নতুন রীতির লেখকেরা আনুগত্য প্রদর্শন করেন না।

(খ) বাহ্যিক ঘটনাগত পারম্পর্য দিয়ে যে কাহিনী গ্রন্থণা সৃষ্টি হয়, তাকে এই রীতির লেখকেরা শিল্পময় গল্প আখ্যা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। নিতান্ত গল্প পাঠের কৌতুহল চরিতার্থ করা তথা বাঙালি পাঠকের স্থূল প্রত্যাশা নিবারণের জন্য লেখনি সৃজনে তাদের অভিরুচি ছিলনা। পাঠকের মনে গল্পটির মাধ্যমে একক অনুভূতির সঞ্চার, গল্পের স্বাভাবিক গঠনগত অবয়বের প্রতি মনোসংযোগ স্থাপন, উপযুক্ত প্রেক্ষিতের পটভূমিকা চিত্রণ, পাঠকের কৌতুহল আকর্ষণীয় করে তোলা, পরিণতির একমুখিনতা, বিবরণভঙ্গিত ঐক্যস্থাপন, একমুখী বক্তব্য উপস্থাপন, চরিত্র সৃজন, লিখনরীতি, সেইসঙ্গে একতম পরম সত্যের উন্মোচন — এইভাবেই ছোটগল্পের কাঠামোকে শিল্পরূপ দেওয়া হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছোটগল্পের ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পেশাদারী, প্রতিভাহীন, নকলনবীশ লেখকদের কবলে পড়ে ছোটগল্প নিছক চমকের জৌলুসে, উদ্বেগের ঘটনঘটায় লেখকের ছলনা করবার শক্তিটিই মূর্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু পরবর্তীকালে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গল্পমালায় ছোটগল্পে কাব্যিক মেজাজ মূর্ত হয়ে উঠল। পাঠক আর নিছক শ্রোতা হয়েই রইল না, লেখকের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দোসর হয়ে উঠল। গল্পের মধ্যে কৌতুলহল তৃপ্তির বিষয়টি ডিঙিয়ে লেখক নিজের অজ্ঞিতালব্ধ অনুভূতির মধ্যে সর্বসাধারণের অনুভূতির অনুরণন উপলব্ধি করতে পারলেন। ছোটগল্পের সঙ্গে কাব্যের বিবাহ বন্ধনের যোগসূত্র আবদ্ধ হওয়ার ফলে তা সকল প্রকার যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি পেল। লেখকের শিল্পী আত্মার এক প্রকার 'সাবজেকটিভ' প্রকাশ গল্পের অন্তর্বয়নে ধরা পড়ে কাব্যিক সংরাগ যুক্ত হওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে। পূর্বে কেবলমাত্র কবিতা ছাড়া লেখকের স্বচিন্তা, ব্যক্তিগত উপলব্ধি, ভাবাবেগের প্রাবল্য, বোধের বিস্ময়জনিত অনিয়ম গল্পে মধ্যে প্রতিফলিত করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আধুনিক রীতির কবিরা নিজেদের ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পূর্ব-সংস্কারের রীতিটি পুরোপুরি ভেঙেছেন। তাদের লেখায় 'সাবজেক্টিভিটি'-র সঙ্গে কাব্যময় সুর একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। গল্প, ঘটনা, সময়ের ঐক্য, চরিত্র, ভাষার ব্যবহার, নাটকীয় মুহূর্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্ব ধারণার সঙ্গে নব্য ধারণার অনেক বেশি পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক রীতির গল্পে ঘটনার বিবৃতি অপেক্ষা প্লটের কারুকার্য বিন্যাসই মুখ্য হয়ে ওঠে। তবে সেখানে প্যাটার্নটি হবে কারণসিদ্ধ, জীবন্ত বিবরণের সঙ্গবদ্ধ রূপ। উপন্যাসের মতোই আধুনিক রীতির ছোটগল্পে বিষয়বৈচিত্র্য, ঘটনার ঘটনঘটা, চরিত্রসৃষ্টি মুখ্য নয়, এই রীতির ছোটগল্পের মূল আধার হল তত্ত্ববাদী আত্মজিজ্ঞাসুর প্রশ্নমুখর জীবন-জিজ্ঞাসা। এই সময়কালীন ছোটগল্পে নব-দিগন্তের শিল্পরূপ ধীরে ধীরে প্রসারতা লাভ করতে থাকে।

কালগত নিরীক্ষণের দিক থেকে ছয়ের দশকের প্রারম্ভিক লগ্নে বাংলা 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'। এই আন্দোলনের মূল নিয়ন্তা হিসেবে বিমল করের নাম সর্বপ্রথমেই এসে পড়ে। এই আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে প্রথমে প্রকাশিত হল 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' নামে একটি পুস্তিকা। যেখানে সম্পাদক হিসেবে কারো নাম ছাপার অক্ষরে ছিল না। প্রচলিত গল্প রচনার ধারাকে ভেঙে নতুন ধরণের বৈপ্লবাত্মক গল্প লেখার প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়ে তরুণদের উৎসাহিত বিমল কর জোরালো বক্তব্য জানিয়েছিলেন। এই মুখপত্র প্রণয়ণের আসল উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে একটি ধারণা তিনি পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যার শেষে 'প্রথম প্রস্তাব' শীর্ষক অংশে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে — ''আমরা আমাদের মনোমত করে গল্প লিখতে চাই, যে লেখা সাধারণত চলতি পত্রিকাগুলির পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়। বস্তুত এই কারণেই আমাদের এই গ্রন্থমালা, যার পাঠক স্বল্প, সহানুভূতিশীল এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। ... তাঁরা তাঁদের রুচি ইচ্ছা এবং মর্জিতে বিশ্বাস রেখে লিখবেন, অন্তত এই গ্রন্থমালার গল্প, আর তাতে যত অল্প পাঠকই জুটুক যায় আসে না।'' [১২]

এই পত্রিকাটি ক্ষুদ্রাকারে পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতি সংখ্যায় একজন করে লেখকের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে একজন নামী শিল্পীর অঙ্কিত লেখকের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি এবং প্রকাশিত গল্প সম্পর্কে সামান্য কিছু মন্তব্য এবং পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল। পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পগুলির নিম্নরূপ — জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু', সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনের রক্তমাংস', মিহির কুমার গুপ্তের 'অনাম্য' এবং বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা'। চতুর্থ সংখ্যায় অতিরিক্ত প্রাপ্তি ছিল 'আধুনিকতার চরিত্র' শীর্ষক দিব্যেন্দু পালিতের একটি মনোজ্ঞ রচনা। লক্ষণীয়, বিমল কর এই আন্দোলনের মূল প্রাণপুরুষ হওে তিনি কিন্তু এই নামে প্রকাশিত একাধিক পুস্তিকার কোনটাতেই তাঁর নিজস্ব গল্প লেখেন নি। বরং প্রথা বিরোধী এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ছোটগল্পের গতানুগতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী ছোটগল্পকে ছোট হতে হবে এবং গল্প হতে হবে এই ধারণার প্রতি তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন। কোনরূপ সাহিত্যগত তত্ত্বকে তারা গল্পের গঠনে আরোপিত করেন নি। ছোট, বড়র পরিমাপ এক হিসেবে অর্থহীন। অনেক গল্পই আছে যা স্বল্পকথায় সংক্ষিপ্তসারে বিবৃত করা যায় না। আবার অনেক গল্পও আছে যা শব্দের স্বল্প সংযোজনে সার্থক হয়ে ওঠে। সুতরাং ছোটগল্পের 'ছোট' কথাটিকে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করা অসম্ভব। কারণ কোনো লেখাই চূড়ান্ত কোনো তত্ত্বমূলক ভাবনায় উপণীত হতে পারে না, তারতম্য এসে পড়ে সম্ভাব্যতার প্রশ্নে। শুধুমাত্র ছোটগল্পের সীমা নিয়ন্ত্রনই নয়, গল্পের

বিষয়ভাবনার দিক থেকেও বৈচিত্র্য আনতে চান তারা। রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনের রূপ বদলের মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের পরিবর্তনকেই তরান্বিত করতে চান তাঁরা। গঠনগত টেকনিক নয়, ভাবজগতের গুরুত্বকে প্রধান্য দিয়ে মানুষের জীবনের অন্তর্মুখীন স্বকীয় যন্ত্রণাকে প্রকট করে তুলবার জন্যই একধরণের কাব্যময়তাকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন এই নতুন রীতির লেখকেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে বাংলা ছোটগল্পে এর অভিজ্ঞতা ও প্রভাব এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, মানব জীবন চিত্র, জীবন সমস্যা, আত্মিক সংকট জনিত প্রশ্নমুখর জীবন-জিজ্ঞাসা আর্ত স্বরটিই ভিন্নধর্মী জীবনবীক্ষণে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকের লেখকেরা তাদের ভিন্নধর্মী জীবন-জিজ্ঞাসার প্রশ্নে পূর্বসূরীদের আনুগত্য স্বীকার করলেও তাদের লেখায় বিপরীতমুখী ভিন্ন স্বাদের গতি প্রকৃতি পরিলক্ষিত। গল্পের কৌতুহল উদ্দীপক টান অপেক্ষা মননধর্মী-তীব্র, তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবন-জিজ্ঞাসার বোধটিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ফলে এই পর্বের গল্পগুলিতে জীবন-বৈচিত্র্যের সম্ভাব্যতা, অনিয়মের বিস্ময়, অস্থির জীবনবোধ, নিয়তির রহস্য সন্ধানে ব্যাকুলতা, অন্তর্জগতের বিষন্নতা, অন্তর্জগত ও বাইরের বাস্তবতার তারতম্য, স্বপ্ন ও চিন্তনে তার আশ্চর্য প্রতিফলন, অন্তর্জীবনের যন্ত্রনাবোধ ও অসহায়ত্ব, আত্ম-আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এই ধারার রীতিকে এক ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। মৃত্যুকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আত্মহননের পথ থেকে বিদ্রোহী সত্তায় রুখে দাঁড়িয়ে ফিরে আসা, নিজের আত্ম-আবিষ্কারের ব্যপ্তিতে গল্পকে আকারে-অনুভবে-প্রয়োগ রীতিতে আর সীমাবদ্ধ থাকতে দেয় না। কারণ আধুনিক সাহিত্যের বিষয় মানব অস্তিত্বের যন্ত্রণা থেকে উত্তরণ তথা 'বোধি'-র প্রশ্ন। আসলে পুরনো রীতি প্রকরণ বিন্যাস এবং গল্পের বিষয়ে পরিবর্তন আনতে অন্তর্মুখিনতার এই স্বাদ আনাটাই হল নতুন রীতি। সমস্ত কিছু একত্রিত করে ছোটগল্প হয়ে উঠল আকারে বড় এবং উপন্যাসের খসড়া কাঠামো বিশেষ।

(ক) আঙ্গিকের দিক থেকে এটি হল নতুন রীতির প্রধান বিশেষত্ব বলা যেতে পারে।

(খ) ঘটনাময় অভিজ্ঞতা নয়, অনুভব উপলব্ধিগত অভিজ্ঞতাই নতুন রীতির উপাদান।

(গ) প্লট অপেক্ষা সিচুয়েশনের উপর গুরুত্ব আরোপ।

(ঘ) বিষয় ভাবার দিক থেকেও গল্পে চরিত্র-অন্তঃসংলাপ-আত্মমগ্ন প্রবাহ রীতিটিই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আর সেইসঙ্গে ভাষার ব্যবহার, সচেতন শব্দ চয়ন ও প্রয়োগের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

(ঙ) রচনাশৈলীর দিক থেকে ইঙ্গিতময়তা ও প্রতীক ধর্মীতা।

(চ) চরিত্রগুলির অন্তর্মুখীন বিলাপ, মনস্তাত্ত্বিক জটিল টানাপড়েনে আক্রান্ত হয়ে নেতিবাচক অনুভূতির শিকার, আত্ম-বিশ্লেষণে যন্ত্রণাদীর্ণ আর্তি, স্বপ্নময় জগৎ, মৃত্যু, আত্মহত্যায় আবর্তিত গল্পগুলির কাঠামো নির্মিত এক অভিনব ভঙ্গিতে। সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে এক গভীর মননধর্মী সংলাপে নিবিড় আস্তিব্যবোধের দ্বারা গল্পগুলি ঋদ্ধ নতুন রীতির শৈলিতে। বিষয়-ভাব গঠন, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, উপস্থাপন রীতির অভিনবত্বে, আবেগহীন পর্যবেক্ষণ শক্তিতে এই রতির ছোটগল্পগুলি যথেষ্ট মননঋদ্ধ — যেখানে নিরন্তর চেতনার আত্মখনন এবং বেঁচে থাকবার তাগিদ থেকে মানবিক দৃষ্টিকোণই উন্মোচিত হয়েছে।

আসলে কোনরূপ তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, নতুন রীতির গল্পে কবিতার বিষাদরাগিণী ও অন্তর্মুখীনতার যুগ্মসত্তার ঐকিক রূপকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে ছক-ভাঙা আঙ্গিকের মিশেলে। উদাহরণ স্বরূপ হিসেবে বিমল কর বললেন আন্তন চেকভ, মপাঁসা বা ও-হেনরির গল্পের আঙ্গিক ধারার প্রসঙ্গ টানলেন যা নতুন লেখকদের আদর্শ হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তাঁর গল্প লেখার সূত্রপাত মপাঁসার গল্পের অনুবাদকে কেন্দ্র করে। নতুন

রীতির গল্পের রূপ ও শিল্প কী হবে — তার যথার্থ বিবৃতি দিলেন বিমল কর। এইভাবে — ''আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে আন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস একাকী হয়েছি — একথা অস্বীকার করা যায় না। ... ছোটগল্পের হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।'' [১৩] এই পরিবর্তনশীল গতি প্রকৃতি নতুন রীতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যটিকে ধরে রাখবার জন্যই জন্ম নিয়েছিল নতুন পত্রিকা ছোটগল্প : নতুন রীতি। এই পত্রিকাটির কোনো সম্পাদক ছিল না। এই পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করে নতুন গল্পকারদের নিয়ে গল্পসংকলন প্রকাশে বিমল কর উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। এই নতুন ধারার সংকলনটির নাম দেওয়া হল 'এই দশকের গল্প'। এই সংকলনের সূচিতে যে সকল গল্প লেখকদের নাম দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন — অজয় দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দিব্যেন্দু পালিত, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন ভট্টাচার্য, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ ভট্টাচার্য, যশোদা জীবন ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকাটি মোটেই স্বস্থ্যবান ছিল না। কিন্তু এর সম্পাদনা গ্রহণের ক্ষেত্রে ছিল যত্নের স্পর্শ। প্রত্যেক সংখ্যা কেবলমাত্র একজন লেখককে নিয়েই প্রকাশিত হত। একজন লেখকেরই গল্প থাকত উক্ত সংখ্যায়, সেইসঙ্গে নামকরা একজন শিল্পীকে দিয়ে ঐ লেখকের একটি লাইন ড্রইংয়ের পোট্রেট অঙ্কিত থাকত। গল্পটির সামান্য পরিচয় এবং দু-চারটি মন্তব্য থাকত সেখানে। তবে এই পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী ছিল না বললেই চলে। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এই পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত লেখক তালিকায় চিত্রিত পাঁচটি নাম হল —

এই নতুন ধারার অভিনব রীতির প্রথম গল্পটি ছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন'। প্রচ্ছদের মাঝে 'দুঃস্বপ্ন' লেখাটি সুন্দরভাবে টাইপ করে ছাপা এবং ততোধিক যত্নে নীচে লেখকের নাম খোদিত। প্রথম সংখ্যায় ছিল ডি. এম লাইব্রেরীর বিজ্ঞাপন। মূল্য নির্ধারিত ছিল ৭৫ পয়সা। প্রিন্টার্স লাইনে ছিল শ্রী অমলকান্তি সেনগুপ্ত, ৮ বি আবদুল রসুল অ্যাভিনিউ, কলকাতা/২৬। 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটি সাড়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রীতির বিষয়ে নানারকম সমালোচনামূলক বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ সকল সমালোচনার জোরালো জবাব দিয়েছিল বিমল কর দ্বিতীয় সংখ্যায়। এই সংখ্যায় গল্প লিখেছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'জটায়ু' গল্পটির পাশাপাশি বিমল করের একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে সমস্ত সমালোচনার জোরালো জবাব দিয়েছিলেন বিমল কর। কোনো কোনো ক্ষেত্র থেকে অভিযোগ উঠেছিল এসব পাগলামির অর্থ ঠিক কোথায়? এখানে গল্পগুলিতে গল্প গল্পহীন ভিন্ন চাঁচে রচিত ছোটগল্পের চরিত্র কোথায়? এই প্রশ্নমুখরতার যথার্থ উত্তর দিতে গিয়ে বিমল কর বলেছেন — ''আমি অপরের গোঁড়ামি যেমন মানতে রাজি নই, তেমনি নিজের ধারণাকে অন্যের কাছে চালাতে সম্মত হচ্ছি না। ... নতুন রীতির পথে সবাইকে আসতে হবে এমন নয়। ...'' [১৪] ফলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমল করের যথার্থ বক্তব্যে নতুন রীতির লেখকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। এই রীতির গল্পগুলির নতুনত্ব সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বিমল কর জানিয়েছেন, ফর্মের ভাবনাটা বা ভাষার ভাঙাচোরা অবয়বের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে কোনো লাভ নেই। কারণ সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো ভাষাই সম্পূর্ণ রূপে বাসি হয়ে যায়। অর্থাৎ শব্দগত সংস্কার নেই বলেই কী নতুন গল্প সৃজন করা যাবে না। গল্পের ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কার যারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মেনে চলেছেন এবং যাঁরা ভেঙেছেন দুই পক্ষকেই বর্তমানে সমান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই নতুন রীতির ছোটগল্প এনে দিয়েছে জীবনের শৃঙ্খলিত সাবেকী জীবনের গতানুগতিকতার প্রশ্ন, জীবনের নানা

বৈচিত্রময় অভিব্যঞ্জনার সমস্যা, শাস্ত্রকেন্দ্রিক অন্ধ লোকাচার, নির্বিচার সংস্কার। বদ্ধ আনুগত্য প্রদর্শন মুখ্য বিষয় নয়। বরং জাগ্রত আত্ম-জিজ্ঞাসু চেতনার জীবন প্রত্যয়ী জিজ্ঞাসা যেন বর্তমান অস্থির বিক্ষুব্ধ জীবন প্রবাহের প্রতীকী দ্যোতনা হিসেবে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও সংস্কার ভাঙা প্রথা অবলম্বন করে ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে উপলব্ধ জীবনের ব্যকারণকে পাঠকের সামনে অভিনব ভঙ্গিতে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। নতুন রীতির তৃতীয় সংখ্যাটির নতুনত্ব আরও মৌলিক। এই সংখ্যার গল্পটি পূর্বের দু'টি গল্পের অভিনবত্ব অপেক্ষা আর নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্নে জারিত। এই সংখ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধায়ের লেখা 'বিজনের রক্তমাংস' যা এতদিনকার প্রচলিত গল্পের গতানুগতিকতার ভিতটিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন আঙ্গিকে, প্রচলিত ছক বাঁধা পরীক্ষণমূলক কৌশলে গল্পটি লিখিত। চতুর্থ সংখ্যায় লিখেছিলেন মিহির গুপ্ত তাঁর 'অনাম্য' গল্পটি। এই গল্পের সমান্তরালে প্রকাশিত হয়েছিল দিব্যেন্দু পালিতের একটি ছোট গদ্য রচনা 'আধুনিকতার চরিত্র'। 'অনাম্য' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের ধারায় সম্পূর্ণ 'ভিন্নধর্মী' প্রচেষ্টা 'নতুন রীতি'-র পত্রিকায় পঞ্চম এবং সর্বশেষ গল্পটি ছিল বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালবেলা' গল্পটি। যা সমকালীন পাঠক সমাজের চেতনার জগৎকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে ব্যক্ত হয়েছে — ''আইডিয়াকে চরিত্র করে এরপর অনেকগুলি গল্প লিখেছিলাম এবং অনুসন্ধান করেছিলাম কোন এক স্থির বিশ্বাসে ডানা গুটিয়ে বসতে। 'কালবেলা' গল্পেই বোধ হয় এইরকম বিশ্বাসের কথা আংশিক ভাবে কিছুটা বলতে পেরেছিলাম।'' [১৫] শিল্পের ব্যকারণগত পন্থা ত্যাগ করে ভিন্ন স্তরে বিষয় খুঁজতে গিয়ে লেখকের শিল্পীসত্তাকে সংস্কার ভাঙা অসঙ্গতিজনক বিক্ষেপে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই যেন নতুন রীতির গল্পকারেরা বেশি আগ্রহী। এই নতুন রীতির পাঁচটি সংখ্যাই বাংলা ছোটগল্পের গতি প্রকৃতিতে বাঁক বদলের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। এই রীতির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমালোচনার এক ব্যাপক ঝড় উঠলেও এর প্রভাবকে সকলেই গ্রহণ করেছিল। 'দেশ', 'নতুন সাহিত্য', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় এই রীতির লেখকদের পক্ষ সমর্থন করে অনেক কথাই প্রকাশ করা হয়েছিল। বাংলা ছোটগল্পে এই যে পরিবর্তন হয়েছিল ভাষাগত ও নির্মিতির ঠাস বুনোটের পরিপ্রেক্ষিতে। ফলে গল্প সাহিত্যের ভিন্নধর্মী ধারায় ভাষার অবয়ব তথা গাঠনিক নির্মান শৈলীই স্বতন্ত্র টেকনিক সহ ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার আস্বাদ এনেছিল।

উনিশ শতকে গল্পের সংজ্ঞা বলতে কেবলমাত্র উপসংহার যুক্ত নিয়ন্ত্রিত প্লটের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রাঞ্জলতা; নিতান্ত একমুখী নিয়ন্ত্রনটাই গল্পের মধ্যে আটপৌরভাবে বিবৃত করা হত। কিন্তু বিশ শতকে প্রকাশ রীতির এক প্রকার অভিনবত্বে, আঙ্গিকের নতুনত্বে গল্পগুলি গতানুগতিকতার আবরণ ছিন্ন করে নতুন তাৎপর্যে প্রতিবিম্বিত হতে শুরু করল। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে কালগত প্রত্নকথার সঙ্গে। মার্কস এবং হেগেল মনে করতেন — শিল্পীর আঙ্গিকের সঙ্গে আশ্রেয় অন্তর্বস্তু ইতিহাসগত ভাবে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। কারণ এই আঙ্গিক লেখকের ব্যক্তিসত্তার খেয়ালো ব্যাপার নয়। আঙ্গিক এবং অন্তর্বস্তুর একপ্রকার ঐক্য থাকা প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিমানুষের জীবনপট যেহেতু পরিবর্তনশীল, সেক্ষেত্রে ভাষা ও চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগে শিল্পের কাঠামোটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। পূর্বে রাবীন্দ্রিক ভাবধারায় গল্পের অন্তর্বয়নগত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কালগত ভিত্তির সাপেক্ষে যে ধারা বর্তমান ছিল, তারই রূপ বদল ঘটতে থাকে চল্লিশের দশক থেকেই। তাই এই সময়ের গল্পের ভাষা, উপমা চিত্রকল্প প্রয়োগের কৌশল, পরিণতির চমক, গল্পের আঙ্গিকগত প্যাটার্ন, কথনভঙ্গির প্রায়োগিক কৌশলে অনেক বেশি তারতম্য লক্ষ্যণীয়। সত্তরের দশকে এই ভাষাগত প্রয়োগের ক্ষেত্রেও

শিল্পীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের নিছক খেয়ালিপনা বৃহত্তম ভূমিকা পালন করেছে। একজন শিল্পী আত্মার খেয়ালি মনোভাব ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হলে তাঁর পাঠকসংখ্যা কমে যেতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ কমলকুমার মজুমদার এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের ভাষারীতির পার্থক্যের প্রসঙ্গ এসে যায়। কমলকুমার মজুমদারের জীবন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভাষারীতির নিজস্ব প্রয়োগ নৈপুন্য থাকলেও কোথাও যেন তাঁর ভাষারীতির বুননে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, ঐতিহ্য বিচ্ছন্ন একপ্রকার অভিজ্ঞতার খেয়ালকে তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছেন। যার ফলস্বরূপ কোনো রূপ ঘরাণা তৈরী হয়ে ওঠে নি, পাঠক সংখ্যা সীমিত পরিসরে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখায় একপ্রকার সংযত ভাষারীতির ক্লাসিক রূপ রয়েছে বলেই তাঁর লেখার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চাশের দশকের শেষদিকের গল্পগুলিতে প্লটের উপর নির্ভরশীল গল্প এবং এর অন্তর্ভূক্ত নাটকীয়তা বর্জনের রীতিগুলি লক্ষণীয়। এই সময়ের দ্রুত আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিমল করের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গল্পপত্র' প্রকাশিত হওয়ার পরিকল্পনা চলছিল। মূলত পুরোপুরি গল্প ও গল্প বিষয়ক ভাবনাটি এখানে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে ভাবা হয়েছিল। বিমল করের উদ্যোগে সহ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন শৈবাল মিত্র এবং শচীন দাশ। তবে বিমল করের সঙ্গে শচীন দাশের ঘনিষ্ট আলাপের সূত্রপাত হয় 'শিলাদিত্য' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার লেখালেখির সূত্রে। বিমল কর তরুণ লেখকদের গল্প লেখার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গল্পের অভিনব টেকনিক আবিষ্কার করার জন্য উৎসাহিত করতেন বরাবর। গল্পের গদ্য রীতি, তার ফর্ম বা শৈলী এবং অভিনব শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে তার অন্তরের বয়ানকে তাৎপর্যমণ্ডিত দ্যোতনায় নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বিমল করই প্রথম অর্ন্তদৃষ্টির প্রখরতায় গল্পের বহির্বাস্তবতাকে সরিয়ে অন্তর্বাস্তবতার উন্মোচন ঘটালেন এক ভিন্নদর্মী গদ্যরীতিতে, ভিন্ন প্রকৃতির আঙ্গিকের মাত্রায়। ফলে যে গল্প এতদিন ঐতিহ্যমুখীন ধারায় ছিল কাহিনী সর্বস্ব, নির্দিষ্ট একমুখী গতিতে পরিণতি নির্ভর, সেখানে ক্রমশ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল অন্তর্মুখীন বোধের এক নিবিড় উপলব্ধি। ফলে হালকা চালের গোলগাল গল্প বা রাউণ্ড স্টোরি এবং গল্পের ভেতরে গল্পহীনতার মধ্যবর্তী পর্যায়ের এক স্তরটির মধ্যেই বিমল কর পরিক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়টি চালিয়ে গেলেন। স্বাধীনতা অর্জনের দ্বৈতরূপের প্রকাশ, ক্রমপ্রসারমান বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দায় জীবনযাত্রার গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যার প্রভাব এই সময়ের গল্পগুলিতেও প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠল। এই সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল নিম্নমধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু মানুষের জীবনকথা তথা অস্তিত্বের সংকট। বিমল করের সম্পাদিত 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলনের গল্পমালার সংখ্যাটিতে এর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালেই বিমল কর-ই ছোটগল্পের সিরিজ বের করেন 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' শিরোনামে। তবে এই নতুন রীতির আন্দোলনে পরিবর্তিত রীতি চেতনা যতটা প্রবল ছিল, পরিবর্তনশীল জীবনচেতনা ততটা বদ্ধমূল ছিল না। এই সময়ের ছোটগল্পে ব্যর্থতার জীবনযন্ত্রণা তথা বিষাদময়তা থেকে জন্ম নিয়েছিল পরাবাস্তবতার প্রতীকী চিত্রকল্প, পুরাণ প্রতিমার মিথলজিক্যাল প্রয়োগ, ফ্যান্টাসি (রূপকথার ঢঙে গল্পে আকল্প নির্মাণ)। গল্পে জীবনের অখণ্ডতার তাৎপর্যের পরিবর্তে টুকরো টুকরো ক্ষয়িত মুহূর্তকে তুলে ধরা হয়েছে। আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক গল্পের মর্যাদা সেইসময় বৃদ্ধি পেয়েছিল গল্পপ্রিয় পাঠকের কাছে। কারণ এই নতুন রীতির গল্পে জীবনের গভীর মূল্যবোধ, জীবনকে জানার স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যময় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকোণ প্রবল আলোড়ণ তুলেছিল পাঠক সমাজের মননে তথা চেতনায়। রবীন্দ্রনাথের হাতে যে সচেতন ফর্মের শিল্পরূপটি বাংলা ছোটগল্পের মূল আধার হিসেবে নির্ধারিত হয়েছিল। নতুন রীতির প্রবল ধাক্কায় সেই মোহময় রূপের স্তর বদলে

গিয়েছিল এক ভিন্নমাত্রিক বাস্তবতার দিকে। বিমল করই প্রথম এই রীতির স্বরূপটি প্রথম পাঠক সমাজের দরবারে উপস্থাপন করলেন। তবে এ প্রসঙ্গে এই রীতির সমকালীন নানা পত্রিকা এই আন্দোলনের ভিন্নমুখী গতি-প্রকৃতিকে চিনিয়ে দিয়েছিল। এই সময় লালমোহন দাস সম্পাদিত 'ছোটগল্প' নামে একটি পত্রিকা ১৯৫৯ সালের সূচনালগ্নে প্রকাশিত হয়। তা নিয়মিত ছিল ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। এই পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ছিল গল্পকারদের ঐক্যবদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন প্রায় খণ্ড ছিন্ন চিন্তার ঐকিক রূপকে সৃজন করা। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল যে —

(ক) পাঠক সমাজের মন জুগিয়ে গল্প সৃজনের পন্থা তাঁরা ত্যাগ করে এসেছেন। তবুও ব্যবসায়িক মুনাফার স্বার্থে ছোটগল্প বর্তমান কালেও বানিজ্যিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক বানিজ্যিক স্বার্থ ক্ষয়িত ভোগ্যপণ্যমুখী মূল্যবোধকেই চিহ্নিত করেছে।

(খ) 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'পরিচয়'-এর বহুমাত্রিক জীবনবোধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ এই সময়ের ছোটগল্পের বিষয়মুখী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি। কারণ বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ ও পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে। বর্তমানকালের আবহাওয়া হল বিচ্ছিন্নতা-অবক্ষয়বোধের ক্ষয়িষ্ণু সময়ের আবহাওয়া। কারণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ক্রমবর্দ্ধমান কালের সঙ্গে তাল রেখে রূপগত সীমার বিস্তৃতি, অভিনব ভাবনা তথা জীবনমুখিতার ভিত্তি নির্মাণ। স্বাধীনতা উত্তরকালীন বাংলা সিনেমা, বানিজ্যিক পত্র-পত্রিকার ক্রমবিসার ও প্রভাব, সকল রকম রুচিহীনতার বিরুদ্ধে এই পত্রিকাটি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছিল। প্রসঙ্গত, পরবর্তীকালে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' গল্পমালার বিমল কর, 'কৃত্তিবাসী' পত্রিকার গল্প সংকলনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এইসকল 'শিক্ষা ও রুচিহীনতা'-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং স্পষ্ট আন্দোলনের প্রয়াসকে ব্যক্ত করেছিলেন। এই ছোটগল্প পত্রিকা গোষ্ঠী নতুন রীতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তব যুক্তিবাদকে অবলম্বন করতে চেয়েছেন সময় বদলের নিয়ম মেনে। 'ছোটগল্প' পত্রিকাটির প্রারম্ভিক পর্ব সূচিত হয়েছিল জেমস জয়েসের গল্পের আলোচনা, চেতনা প্রবাহ রীতির অভিনব ঢঙ নিয়ে আলোচনার বিবৃতি এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় পর্বে ছোটগল্পের প্রাণ স্বরূপ হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল জেমস জয়েসের চেতনা প্রবাহ রীতির ঢঙ এবং অ্যালবেয়র কাম্যুর প্রকাশগত ভাষারীতির প্রবল নিরাসক্তি। বিশেষ করে লেখার বক্তব্য পেশ করার চেয়ে অন্তমুর্খীনতার দিকেই এঁদের ঝোঁক ছিল বেশি। তবে লেখন ভঙিতে অনেক ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ বজায় ছিল না। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু পালিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য আরও অনেক ছোটগল্পকার এখানে গল্প লিখেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ কিছু আলোচনা এখানে বিবৃত হয়েছে। দেবেশ রায়ের প্রবন্ধ 'ছোটগল্প নতুন পুরুষের আবির্ভাব' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা এখানে প্রকাশিত হয়েছিল। যেখানে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে নতুন রীতির গল্পে প্রকৃতিগত ধারার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বিবৃত করে তিনি ছাড়েন নি, বিগত সত্তর বছরের বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্যকেন্দ্রিক ধারা ও পরবর্তীকালের ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন ধারার তারতম্য জনিত পার্থক্যকে পাঠক সমাজের কাছে উন্মোচন করলেন। নতুন প্রজন্মের বিপরীত মুখী ধারার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেবেশ রায় চিহ্নিত করেছেন —

(ক) এই রীতির গল্পগুলির সূত্রপাত হয়েছে অভিনব ঢঙে।

(খ) কালের ব্যবধানকে সীমায়িত করে জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিকতার নিরিখে দেশ-কাল-সময়ের পরিসরকে চিহ্নিত করা।

(গ) সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনের অবক্ষয়কে তুলে ধরা জটিল সম্পর্কের টানাপড়েনকে বোঝাতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার সৃজন। ফলে গল্প হয়ে উঠল জটিল দুর্বোধ্য। দীর্ঘ সময়ের পরিসরে, যন্ত্রণাদীর্ণতা বেং নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে ডিটেল ধর্মিতার যথার্থ প্রয়োগ। বহুমাত্রিক যন্ত্রণাদীর্ন পরিবেশ সাপেক্ষে উপলব্ধ অভিজ্ঞতাকে নানা প্রতীক, ভঙ্গি, দৃষ্টিকোণে বৈচিত্র্যে প্রতিকায়িত করা হল। ফলে গল্পে প্রতীক ধর্মিতা, চিত্রকল্পের সচেতন প্রয়োগ এবং চাহনির তির্যক ব্যঞ্জনা প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়।

(ঘ) গল্পের মধ্যে গল্পহীনতা সৃজনের একপ্রকার প্রয়াস নতুন রীতির গল্পের অন্যতম উপকরণ যেমন, দেবেশ রায়ের 'দুপুর', 'পা', দিব্যেন্দু পালিতের 'দুঃসময়'। এ প্রসঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের বক্তব্য অনুসারে, সাম্প্রতিক ছোটগল্পের গঠনগত কাঠামোটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর বাচনিকতায় বাংলা ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য প্লট নয়, থীম। মতি নন্দীর কথায় — একগোষ্ঠী নিরেট বাস্তবকে চুরমার করে ভেঙে দিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নতুন কিছু সৃজন করতে চান। অন্যগোষ্ঠী বাস্তবের সংস্পর্শেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে গল্প বুনতে চান। এক্ষেত্রে আঙ্গিক সচেতনতার সঙ্গে বিষয় সচেতনতাও প্রয়োজন। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন সেন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শচীন বিশ্বাস, মলয় রায় চৌধুরী, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা ছোটগল্পের নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকটি উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নৈহাটি থেকে 'ছোটগল্প : নব নিরীক্ষা' নামে একটি ক্ষণজীবী পত্রিকার উদ্ভব ঘটেছিল। যেখানে দেবেশ রায়ের 'সণাক্তকরণ', সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' এবং সেইসঙ্গে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের উপর ভিন্নধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলেন পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ১৯৫৮-৫৯ সালে বিমল করের প্রকাশিত 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' বিষয়ে কতগুলি মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেছিলেন। পঞ্চম সংখ্যায় এই নতুন রীতি নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার ভাবনার জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরা হল —

(ক) এই ধারার নতুন লেখকেরা তাদের মনোমতো করে গল্প লিখতে চেয়েছেন। যে লেখা সাধারণত বানিজ্যিক চলতি পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই কাররেই এই গ্রন্থমালার পাঠক সংখ্যায় স্বল্পতম, অনুভূতিপ্রবণ, সহানুভূতিশীল এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

(খ) বাহ্যিক ঘটনাগত পারম্পর্যে যে কাহিনীর প্লট তৈরী হয়েছে। তারা তাকে শিল্পময় গল্পের কাঠামো নির্দেশ করতে চাননা।

(গ) গল্পের হৃদয়কে আর্টের স্বতঃস্ফূর্ততায় শুভ্রতা বজায় রাখার জন্য গল্পের গদ্যশৈলিতে কবিতার মেজার সৃজন করতে চেয়েছেন। ছোটগল্পের সাবচেক্টিভিটির সঙ্গে বকিতার সুরের যুগ্মরূপকে বিবাহ দিতে চেয়েছেন।

(ঘ) গল্প, চরিত্র, ভাষার ব্যবহার, সময়ের ঐক্য, ঘটনার ক্ষেত্রে নাটকীয় মুহূর্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরাতন ঐতিহ্যগত ধারণার সঙ্গে নতুন ধারার ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার অনের তারতম্য।

(ঙ) ঘটনার চমক সৃষ্টি, বাঁধাধরা নিয়মে নির্মিত গল্প, চরিত্র সৃজন — ইত্যাদি গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, বিমল কর ১৯৬০ (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭) সালে 'এই দশকের গল্প' নামে একটি গল্প সংকলন সম্পদনা করেছিল। দুষ্প্রাপ্য এই গল্পগুলিতে উল্লিখিত গল্পগুলি হল — অজয় দাশগুপ্তের 'ফানুস', দিব্যেন্দু পালিতের 'দুঃসময়', অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'কোনো এক লেখক বন্ধুকে', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাদ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া', প্রবোধ বন্ধু অধিকারীর 'নকল নক্ষত্র', দেবেশ রায়ের 'দুপুর', মতি নদীর 'চোরা ঢেউ', বরেন গঙ্গোপাদ্যায়ের 'তোপ', যশোদাজীবন

ভট্টাচার্যের 'প্ল্যাটফর্মের গল্প', শঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ের 'যৌবন', রতন ভট্টাচার্যের 'পিঞ্জর', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তুষার হরিনী', শীর্ষেন্দু মুখোপাদ্যায়ের 'আমার মেয়ের পুতুল', সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের 'দশ বছর পর একদিন', স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলপোকা', সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'হাউই'। এই বইটির ভূমিকাংশে বিমল কর বলেছিলেন যে, এ সকল উল্লিখিত লেখকেরা শিক্ষানবিশীর পর্যায় অতিক্রম করে নিজস্ব স্বতন্ত্র পথ অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। নৈরাজ্যের যন্ত্রণা জনিত আত্ম বিদ্রূপ বিশ্লেষণ তাদের লেখনিতে সুনিপুন ভাবে ফুটে উঠেছে। নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা নিজস্ব শিল্পস্বভাব, ফর্ম সচেতনতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে অতিসাধারণ ঘটনাধারার মধ্য দিয়ে কৈল্পিক জগতে রোমন্থন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত অবক্ষয়িত মানুষের আবেগ ও আবেগহীনতার দ্বন্দ্ব, আত্মিক সংকট, মানসিক বিচ্ছিন্নতার নিরাবরণ প্রকাশ এ ধারার গল্পগুলির প্রধান প্রাণকেন্দ্র। এছাড়া সংকলিত গল্পে লেখকদের সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রাখা হয়েছে। মতি নন্দীর লেখার অতি সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় বুদ্ধি প্রাধান্যের আন্তরিক সংযমী মেজাজ, দেবেশ রায়ের লেখায় তত্ত্বাশ্রয়ী সাংসারিক জীবনের অন্তরঙ্গতার জলছবি। অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখায় চিন্তাপ্রধান আদর্শের মানবিক বক্তব্য উপস্থাপন, শ্যামল গঙ্গোপাদ্যায়েরর লেখায় সত্তার দ্বান্দ্বিক রূপ তথা মানসিক বিকৃতি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় বাস্তবতার অভিযোজিত সরল প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের অনুভূতিপ্রবণ মননের আধিক্য — ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এই 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটি প্রধান হয়ে উঠেছিল, তা হল ছোটগল্প কি নিছক গল্প, না এর অন্বেষণ অন্য কোথাও ? বাইরের ঘটনার বিবরণ, না অন্তর্জগতের মনন সমৃদ্ধ আত্ম-আবিষ্কার ? তরুণ লেখকদের মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন — ''ধারা বদলের কিংবা নতুন একটি রীতি প্রবর্তনের তীব্র ইচ্ছাতেই যে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নয়। বরং এর মধ্যে আত্ম-আবিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা ছিল। ... তবু তাঁরা পুরোনো রীতি, প্রকরণ, বিন্যাস এবং বিষয় ত্যাগ করতে চাইছিলেন — বহির্মুখীনতার চেয়ে তাঁরে কাছে স্বাদুতর ছিল নিজেদের অন্তর। তাই তাঁদের লেখায় স্বকৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির লেখায় স্বকৃত আত্ম-প্রতিকৃতির প্রক্ষেপ ঘটেছিল বারংবার, পাওয়া যাচ্ছিল স্বীকারোক্তির আভাস, চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে তির্যক কিংবা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল সমাজ এবং বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলী।" [১৬] এই নতুন রীতির ছোটগল্পকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। এই রীতির ছোটগল্পে গল্পহীন গল্প, নৈর্ব্যক্তিকতা, ক্ষয়িষ্ণু অবক্ষয়চেতনার গল্প পূর্বে আমরা বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পেও পেয়েছি। অশোক রুদ্রের একটি প্রবন্ধ 'পরিচয় ও সাহিত্যিক দায়িত্বহীনতা' নামে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের 'ইচ্ছামতী' দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুল ফোটার গল্প', সত্যগুপ্তের 'ঘোলাজল নোনা জল', প্রদ্যোৎ গুহের 'কথা কও' প্রভৃতি গল্প নিয়ে নতুন রীতির গল্প বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। 'ছোটগল্প : নতুন রীতি'-র আন্দোলন বিমল করের বক্তব্যে 'ইমপ্রুভমেন্ট' এই শ্লেষ দিয়েই তাঁর লেখনি চালিত। 'পরিচয়' যেহেতু মার্কসবাদীদের কাগজ, তাই এক্ষেত্রে এসকল গল্প প্রকাশে তিনি মার্কসবাদীদের দায়িত্বহীনতা লক্ষ্য করেছেন। কারণ গল্পগুলিতে 'আকারহীন অস্পষ্ট বিষয় নির্বাচন' লক্ষ্যনীয় যা মার্কসবাদ সম্মত নয়। সত্যগুপ্ত ও প্রদ্যোতগুপ্তের লেখনির ধরণেও আছে গ্লানিবোধ তথা অপরাধ কথা — যা মার্কসবান বিরোধ। দেবেশ রায়ের 'গোপাল ও কলকাতা' আছে নায়কের ব্যর্থতা জনিত বেকারতত্বের চিত্র, ইতিহাসবোধের প্রত্নকথা। তবে এ সময়ের অনেক গল্পে গল্পের সঙ্গে কাব্যময়তার মেলবন্ধন নয়, আছে

গল্পের সঙ্গে ধাঁধার একরৈখিক সংযোজন। সেইসঙ্গে রয়েছে স্থান-কাল-পাত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, চেতনা প্রবাহ রীতির বুনটহীনতা এবং আরোপিত বিচ্ছিন্নতা, লেখার ভাষায় কাল্পনিক স্বপ্নের প্রলাপ, বাংলা ভাষার পরিবর্তে প্রতীকী কোড ভাষার ব্যবহার। তবে অশোক রুদ্র মহাশয় বিমল করের দেওয়া বক্তব্য তুলে বলেছেন যে, কেন বাংলা সাহিত্যে ১৯৬৭ সালে নতুন রীতির সাহিত্য আন্দোলনের আবির্ভাব এর নির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। কী-ই বা তাদের নতুন রীতি, নতুনত্বের ছাপ সে বিষয়ে কোনো নির্ধারিত কারণ উল্লেখ নেই। তবে এই রীতির লেখকেরা বহির্জগতের তুলনায় অন্তর্জগতের প্রাধান্য দিতে গিয়ে ঐতিহ্যবিচ্যুত রূপক প্রতীক সুররিয়ালিজমের পথ বেছে নিয়েছেন। দেবেশ রায় এই প্রবন্ধের জোরালো উত্তর দিতে গিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় জৈষ্ঠ্য ১৩৬৮-তে 'সমালোচকের দায়িত্ব' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। যেখানে তিনি অশোক রুদ্রের বক্তব্যের ত্রুটির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁর মার্কসীয় বোধের চিন্তনকে নাকচ করে দেন। 'ছোটগল্প' পত্রিকায় 'ছোটগল্প নতুন পুরুষের আবির্ভাব' প্রবন্ধে দেবেশ রায় নতুন গল্পগুলির ঐতিহাসিক ধারার প্রেক্ষাপট, ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্য এবং নতুন রীতির গল্প ধারার স্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন। যেখানে —

(ক) নতুন ভঙ্গিতে গল্প কথন।

(খ) ক্ষুদ্র কালগত পরিসরে দেশ-কাল ভিত্তিক সমস্যাকে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা।

(গ) জটিল প্রতীক, অনুষঙ্গ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একাধিক ঘটনার প্রয়োগে সামাজিক জটিল ভাবনার প্রতি আলোকপাত করা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘাম' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঘ) এই রীতির গল্পগুলিতে দুরূহতা নয়, জীবন-জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক রূপকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে।

(ঙ) ডিটেল ধর্মী বয়নাকে বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট সময়বৃত্তে সুদীর্ঘ কালীন সময় বৃত্তকে তুলে ধরা হয়েছে।

(চ) গল্পহীন গল্প রচনার প্রতি লেখকের সচেতন দৃষ্টি, প্রতীক ধর্মিতার ব্যবহার, জীবনের গভীরতর বোধের বহিঃপ্রকাশ। উদাহরণ স্বরূপ দেবেশ রায়ের 'পা', 'দুপুর' গল্পগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, সকল লেখকেরা কিন্তু অভিনব ঢঙে গল্প লিখছেন না কিংবা দেশ-কালের জটিল সমস্যার কথা অনেক গল্পে নেই, এবং দুরূহতার প্রশ্নে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাদপের হরিণী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেবেশ রায় নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেন এই নতুন রীতির আন্দোলন উল্লিখিত গল্প লেখকদের সৃজিত নয়, ১৯৫০ সাল থেকেই এরকম ধরণের একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। সমান্তরাল ভাবে ঐতিহ্যানুসারী গল্পের পাশাপাশি নতুন রীতির গল্প প্রকাশ করে পাঠকের নজর কেড়েছে। তবে এই অভিনবত্ব হল 'আত্মার সমস্যার সন্ধান'। আরও বিস্তৃত ভাবে বলতে গেলে — ''এই শতকের পীড়িত, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মা সন্ধানই আমাদের সাহিত্যের বিশেষ বিষয়।'' [১৭] এই ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেই গল্পে এসেছে রিপোর্টার্স ধর্মী বিবৃতি, কাব্যিক মেজাজের সুর, নাটকীয় ঢঙ, সুররিয়ালিজমের ছটা, চেতনা প্রবাহের আবেগ রোমন্থন, আত্মকথনের অন্তঃবিলাপ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ১৩৬৭ ফাল্গুনের 'পরিচয়' পত্রিকায় এই আলোচনা সূত্রে যে বক্তব্য পেশ করেন তা হল — অশোক রুদ্রবাবু মার্কসবাদী চিন্তনের অলোকে নতুন রীতির ছোটগল্পের যে সীমাবদ্ধতা টেনেছেন, তার পরিবর্তে শিল্প বিচারেও এদের অভাবের

জায়গাটিও দেখানো যেতে পারে। এ ধরণের গল্পে দেশের কালিক সময়বৃত্তে জীবন সম্পর্কিত কোনো গভীর জিজ্ঞাসা তিনি অনুসন্ধান করতে পারেন নি। তাঁর উপলব্ধিতে দেশ মানে নাগরিক জীবনের ক্লান্ত বিকৃত বিলাসিতায় পূর্ণ মধ্যবিত্ত নারী পুরুষ বোঝায় না। চেতন প্রবাহের ইউরোপীয় সাহিত্যিক মডেল আমাদের ভিন্নমুখী জীবন যাপনে প্রয়োজনীয় নয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৬৭ সনে অসিত উপাধ্যায় ঐ একই সংখ্যায় অশোক রুদ্রকে আক্রমন করে বলেন যে তাঁর আগ্রহপূর্ণ বিনয় পরস্পর বিরোধী। অসিত উপাধ্যায়ের উপলব্ধিতে — চরিত্রের ব্যাকরণগত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অপেক্ষা বড় বিষয় হল যন্ত্রনার অবয়বটিকে উন্মোচন করে একাকিত্বের শূন্যতাটিকে মূল্যায়ন করা। এরপর বলা যেতে পারে, 'এক্ষণ' ফাল্গুণ চৈত্র, ১৯৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তি বসুর লিখিত 'সময়ের চাবি' প্রবন্ধটির কথায়। বিমল করের 'এই দশকের গল্প' গ্রন্থটির সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল — বিমলবাবু পাঠক সমাজের মানসিক জগতে কোনো প্রশ্নই সৃজন করতে পারেন নি। গভীর শ্লেষের মাধ্যমে শান্তি বসু বিমল কর প্রণীত নতুন রীতির লক্ষণগুলি — অন্তর্মুখিনতা, আত্ম-আবিষ্কার, একাকিত্ব জনিত শূন্যতা ইত্যাদিকে গভীর ভাবে বিদ্ধ করে ব্যক্ত করেছেন — নিজেদের সম্পর্কে এক ধরণের মোহ পোষণ করে 'ক্ষরণ, অস্তিত্ব, বোধি' ইত্যাদি কথাগুলি আধুনিকতার মূল লক্ষণ নামে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরও বলেন নতুন রীতি আন্দোলনের পাশাপাশি মার্কসবাদী ধারার সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারা সমান্তরালে প্রবাহিত। প্রবন্ধের একেবারে পরিণতি পর্বে শান্তি বসু জানিয়েছেন যে — ''এই দশকের গল্প সংকলনের প্রতিটি লেখায় মনুষ্যত্বহীনতার দম্ভ ও লেখার অক্ষমতা মর্মান্তিক ভাবে পীড়িত করে।'' [১৮] মানুষকে ঐতিহাসিক প্রত্নসময়ের অংশ হিসেবে চিহ্নিত না করে কাম-লোভ-ক্রোধ-শোক মেনকি মোহের পুতুল হিসেবে দেখাই এঁদের কেমাত্র বিলাস। কারণ 'পাপবোধ ও আদর্শ ধ্বংস এঁদের বীজমন্ত্র'।

এই সময়কালীন পর্বে 'প্রবন্ধ' পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৮ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ সনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নতুন গল্পের কথা' লেখায় লেখক বলেচেন নতুন রীতির গল্পে মনই প্রধান ভিত্তি। আজকের শিল্প নির্মিতি প্রকৃত অর্থেই ইন্ট্রোর্ভাট, যার প্রতিফলন চৈতন্য প্রবাহের চোরা স্রোতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার ভিন্নতার। নতুন রীতির স্টাইল, গতিপ্রকৃতি সম্মুখের দিকে ধাবিত কিনা এ বিষয়ে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন তোলেন। আবার সমীর মুখোপাধ্যায় 'প্রবন্ধ' পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৬৮ সনে 'সাম্প্রতিক ছোটগল্প ঃ একটি মত' প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের 'দুপুর', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিপ্রেক্ষিত' গল্পের আলোচনা সূত্রে বলেছেন যে এই নতুন রীতির আন্দোলন নিঃসন্দেহ তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৩ অগ্রহায়ণ 'দেশ' পত্রিকায় অশোক সেন বলেছেন — দুরূহতা গল্পগুলির রস আস্বাদের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলেও সূক্ষ্ম রুচি সম্পন্ন সাহিত্যবোধ এই ধারার প্রধানতম গুণ। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের ৩ অগ্রহায়ণ 'দেশ' পত্রিকায় শঙ্কর চক্রবর্তী বলেছেন যে, এ ধারার গল্পে আছে 'একধরণের দুর্ভেদ্য রহসযময়তা' যা ছোটগল্পের যথার্থ মূল্য বিলুপ্ত করেছে। 'দেশ' পত্রিকায়, ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে সুজন বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনায় বলেছেন, অবাস্তব বিষয় বর্ণনার ভঙ্গির সঙ্গে উপমার বিরক্তিকর বিসদৃশতা, অতিরিক্ত মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসই এ ধারার প্রধান সমস্যা। ১৩৬৭, ১০ই অগ্রহায়ণ 'দেশ' পত্রিকায় প্রদীপ বলেছেন — যে এ ধারার গল্পে ডিটেলের প্রতি আগ্রহ, ভাবালুতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির ব্যঞ্জনা থাকলেও কোনোটিই কার্যকরী নয়। ১৩৬৭, ১০ই অগ্রহায়ণ 'দেশ' পত্রিকায় গল্পে কাহিনীর পরিবর্তে সূক্ষ্ম মনো-বিশ্লেষণী গভীর অন্তভেদী দৃষ্টিতে মানব প্রকৃতির সমগ্র রূপের উন্মোচন থাকলেও অন্তর্জগতের বিষয়টি দুরূপ থেকে যায়। ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী বলেছেন যে জীবন প্রত্যয়ের অভিনব ভাষ্য, মনোজগতের রহস্যময়তা,

যুগচেতনাকে প্রতিবিম্বিত করতেই নব্য রীতির প্রয়োজন ছিল। ১৩৬৭ সনের ১২ই কার্তিক বিমল বসু জানিয়েছেন এ ধারা গল্পগুলি আধুনিক কবিতার সমগোত্রীয়। ভাবের বিচ্ছিন্ন আরশি, বক্তব্য প্রকাশে অস্পষ্টতা গল্পের বিষয়টিকে আরও দুরূহতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। 'দেশ' পত্রিকায় ২রা পৌষ ১৩৬৭ সনে ঐ একই বক্তব্য পোষণ করেচেন। এগুলি আদৌ গল্প নয়, স্বপ্নের প্রবাহ, ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার ডায়েরী। সমকালীন পাঠকের প্রতিক্রিয়া। প্রচলিত ধারার বিরোধী বলেই এটি অধিকাংশ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। 'প্রবন্ধ' পত্রিকায়, চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'নতুন রীতি, না রীতির নতুনত্ব' প্রবন্ধে এই ধারার গল্পবিষয়ে আলোচনা করে কথা সাহিত্যিক মিহির আচার্য বলেছেন — আজকের গল্পে ভাষা রীতির নতুনত্ব, দৃষ্টিকোণের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও শক্তির অপব্যায়কে প্রদর্শন প্রবণতায় কাজে লাগিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন যে নব্য রীতির গল্প রচনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং বিমল করের প্রেরণা উল্লেখযোগ্য। যেখানে 'অর্থহীন ন্যাচারালিজম'-এর অদ্ভূত সংমিশ্রণ লক্ষ্যণীয়। তবে এই নতুন রীতি মানেই প্রগতিশীলতা নয়। অগ্রহায়ণ ১৩৬৮ সালে 'প্রবন্ধ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সাম্প্রতিক গল্প প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে নব্য রীতির গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন —

(ক) চরিত্রের সঙ্গে লেখক এক অভিন্ন সত্তা, উত্তমপুরুষে বিবৃতি উপস্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) চিন্তনের জটিলতা চরিত্রগুলি আকীর্ণ।

(গ) অদ্ভূত বিশেষণ উপমার ঝোঁক, অনাবশ্যক পুঙ্খানুপুঙ্খতা।

(ঘ) (Euphonye) প্রতি আগ্রহ।

তবে নতুন রীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বিপরীতমুখী ব্যতিক্রমী প্রবণতা সম্পর্কে এই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল কয়েকটি গল্পকে কেন্দ্র করে। অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'কোন লেখক বন্ধুকে' গল্পে ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত চমক স্থাপন, বহির্মুখীনতার প্রতি ঝোঁক। মতি নন্দীর 'চোরা ঢেউ' নতুন রীতি থেকে যেন কিছুটা ভিন্ন গোত্রের হয়েও প্রশংসনীয়। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' আত্ম সমীক্ষণ তথা জীবন বিশ্লেষণের অভিনব জিজ্ঞাসার উন্মোচন করেছে। স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলপোকা' সম্পর্কে বলেছেন — এখানে 'মার্জিত লিপি চাতুর্যের পরিচয়' বর্তমান। এই নতুন রীতির ধারায় আলোচনায় আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন হেমেন্দ্র মোহন রায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ প্রমূখ। 'অমৃত' পত্রিকায় ১১ই মে ১৯৬২ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন 'গল্পছুট', 'অমৃত' পত্রিকায় ১১ই মে ১৯৬২ সালে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সাম্প্রতিক বাঙলা ছোটগল্প' প্রকাশিত, 'দেশ' পত্রিকায় ১৬ই জুন মাসের ১৯৬২ সালে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুহূর্তের ভাষ্য' লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে 'দেশ' পত্রিকায় 'সময় সাহিত্য সমালোচনা' শিরোনামে প্রকাশিত একাধিক রচনার মধ্যে তৃতীয় প্রবন্ধ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুহূর্তের ভাষ্য' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আষাঢ় ১৩৬৯ সালের 'দেশ' পত্রিকায়। যেখানে সাম্প্রতিক ছোটগল্পে নব্য রীতি প্রসঙ্গে, বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে কিছু মূল্যবান বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধটির সূত্রপাত হয়েছে কবিতা এবং ছোটগল্পের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয়, তরুণ ও অগ্রজ লেখকদের লেখনি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা। দেহের চেয়ে আত্মার যন্ত্রণাটিই আরও ব্যাপক হারে বিস্তৃতি ঘটানো। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'অস্মিতার রত্ন প্রদীপ', কাব্যময়তার রোমান্টিকতার কথা। দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের আলোচনা। সামাজিক নানা অসঙ্গতির কথা, ক্যামেরা বা আরশির প্রতি চরম অনীহা — মুখ্যত জীবন পিপাসু জিজ্ঞাসার প্রতি অনুরাগ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজনই বোধ হয় বাঙলা সাহিত্যে অস্তিত্ববাদের আন্তরিকতম

চেহারা'। প্রবন্ধটিতে ভিন্ন মুখী অনুসন্ধান যুক্ত আলোচনা। নব্যরীতির শিথিলতা বিষয়ে শ্লেষ থাকলেও যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ছিল না। 'এই দশক' পত্রিকায় ৪র্থ সংকলনে, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে কবি পুষ্কর দাশগুপ্ত বক্তব্য রেখেছিলেন যে — বিশ শতকীয় পশ্চিমী কথাসাহিত্যের সৃজনশীল আদর্শেই নব্য রীতির গল্পধারা পরিচালিত। তবে লক্ষণীয়, যে কবিতার সঙ্গে ছোটগল্পের মেলবন্ধনের সূত্রে অসংযত তরল ভাবালুতা এবং আবেগঘন রোমান্টিকতার অহেতুক আগমনী বারে বারে প্রতিবিম্বিত, চেতনা প্রবাহ রীতির লক্ষ্যহীন ব্যবহার, অনাবশ্যক ফুটনোট এবং ব্রাকেটের প্রয়োগ বেশির ভাগ লেখাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে ইতিহাস খনন করলে পরিলক্ষিত হবে যে, নতুন রীতির তাৎপর্যপূর্ণ লড়াইটি চালিয়েছিলেন দেবেশ রায় তাঁর দু'টি প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। তাঁর সম-সাময়িক গল্পকার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেমাত্র তিনিই নতুন রীতির পঞ্চাশ দশকীয় রীতি-নীতি, ঐতিহ্যাশ্রয়ী প্লট নির্ভর গল্প ছেড়ে ছোটগল্পের ধারাকে দেশ-কালের ব্যাপ্তীকে, বর্ননাধর্মী বিস্তারে, সাংবাদিকতা ধর্মিতায় অন্য খাতে বইয়ে দেন। অমলেন্দু চক্রবর্তী, শীষেন্দু মুখোপাদ্যায়ের লেখায় এইবিপরীতমুখী ধারার প্রবাহ বহমান। আসলে অন্তর্মুখী চেতনার প্রতি ঝোঁক, আত্ম প্রকৃতির একাধিকবার প্রক্ষেপ, চেতনা মগ্নরীতি, সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত রূপ উন্মোচনই যেন নব্য রীতির অভিনবত্বকে প্রতিকায়িত করেছে। ক্ষণস্থায়ী হলেও এই নতুন রীতির আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বড় বড় পত্রিকার প্রলোভন এবং চাপ, পাঠক সমাজের বিরূপ মনোভাব, অর্থনৈতিক দায় গল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবানিতেই বলা যেতে পারে — 'সামাজিক স্বপ্ন ভঙ্গের অভিঘাত' এই নব্য রীতি গল্পের আশ্রয়। মার্কসবাদী এবং অমার্কসবাদী দুই ধারারই স্রোত এসে মিলেছিল পঞ্চাশ-ষাটের দশকের নতুন রীতির গল্প আন্দোলনে। যার অনুরণন দীর্ঘ প্রসারী একথা বলাই বাহুল্য। তবে এই নতুন রীতির আন্দোলনে মূল বিষয়ে লেখকেরা নিছক বস্তুগততাকে নয় ভাবনার শিকড়ের শূণ্যতা, বৈপরীত্য এবং অবিন্যস্ততাকে গভীর উন্মোচন করেছেন।

ছোটগল্প : নতুন রীতি প্রসঙ্গে অবশ্যই বিমল করের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তিনি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতায় ছোটগল্প নিয়ে চর্চা, নব-নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় যখন গল্প মনোনয়নের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব নিয়ে অফিসে বসতেন। এই সময় কমলকুমার মজুমদারের তিনটি গল্প নির্বাচন করেন — 'মতিলাল পাদরী', 'তাহাদের কথা', 'নিম অন্নপূর্ণা'। এছাড়া দেবেশ রায়ের 'আহ্নিক গতি', 'মাঝখানের দরজা', 'পা' — ইত্যাদি অনেকেরই উল্লেখযোগ্য লেখা ছাপা হয়েছিল। এছাড়া ডাকযোগে পাঠানো অনেক অনামী লেখকদের লেখাও প্রকাশ করা হয়েছিল। তাঁর ছোটগল্প : নতুন রীতি পত্রিকায় উল্লেখ পাঁচটি গল্প ছাড়াও বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সহবাস' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নিজেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন এইসব কাগজে অর্থশ্রম ব্যয়িত হলেও প্রচুর নতুন লেখা অসাধারণ জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র বয়নে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

উৎস সূত্র :

১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, বিবেক ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৩, পৃ: ভূমিকাংশ।

২। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাইগল্প, ঐ।

৩। আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা বিমল কর, করুণা প্রকাশণী, আশ্বিন ১৩৯২, পৃ: ৮৮।
৪। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, বিবেক ভারতী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৩, পৃ: ভূমিকাংশ।
৫। বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিকেল, মে ১৯৯৩, পৃ: ৪৭।
৬। তদেব, ঐ, পৃ: ৪৮।
৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৯, পৃ: ২।
৮। তদেব, ঐ।
৯। তদেব, ঐ।
১০। তদেব, ঐ।
১১। সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৫, পৃ: ২০২।
১২। তীব্র কুঠার, ছোট গল্প ও ছোটগল্প বিষয়ক বিমল কর বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক বীরেন শাসমল, সম্পাদকীয় দপ্তর, ফ্ল্যাট নং বি/৭, ক্লাস্টার ১৪, পূর্বচল হাউসিং এস্টেট, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৯৭, বইমেলা ২০০৩, পৃ: ২৯৬।
১৩। তদেব, ঐ, পৃ: ৪০৩।
১৪। তদেব, ঐ, পৃ: ৪০৪।
১৫। তদেব, ঐ, পৃ: ৪০৫।
১৬। কালের পুত্তলিকা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৮২ প্রথম প্রকাশ, পৃ: ৪০৮।
১৭। বাংলা ছোটগল্প : কৃতী ও রীতি, রবিন পাল, ব্রহ্মপুর প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৯, পৃ: ২৬৬।
১৮। তদেব, ঐ, পৃ: ২৬৮।

————